Narasinha Dutt College Alumni Association

দর্পণ

প্রথম সংখ্যা

129, BELILIOUS ROAD, HOWRAH - 711 101

Regd No. - S/12/51524

নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

“ প্রাক্তনী ” প্রকাশিত

“দর্পণ”

প্রথম সংখ্যা - ২০২২

“নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।”

আমাদের যে সকল শিক্ষক,
শিক্ষাকর্মী ও প্রাক্তন ছাত্র বন্ধু মর্তলোক থেকে
অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন,
তাঁদের প্রতি আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

" অধ্যক্ষর " কলম

সেদিন একটা কাজে আসতে হয়েছিল কলেজ পাড়ায়। মাঝে মাঝেই আসি কিন্তু সেদিন কেন জানি মনে হল কলেজে একবার ঢুকি। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলাম। ঠিক কলেজে ঢোকার মুখেই অনেক কিছুর সাথে মনে পড়ে গেল কলেজের ভিতরের পুকুরটার কথা। এখনও কি আছে? দেখা যাক। ঢুকে পড়লাম। গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখলাম বাঁদিকের যে জায়গাটা ফাঁকা পড়েছিল সেখানে দুজন মনীষীর মূর্তি বসানো হয়েছে, তার চারিদিকে ফুটে আছে রঙবেরঙ এর ফুল। বেশ দেখাচ্ছে জায়গাটা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঠিক সামনেই রয়েছে পতাকা উত্তোলনের উঁচু স্তম্ভ। ওই তো পুকুরটা! একই রকম আছে শুধু পাড় বাঁধিয়ে যেন খড়ির গন্ডি দেওয়া হয়েছে। বাঁধানো ঘাটের একটা সিঁড়িতে দাঁড়ালাম। জলে আমার ছায়া পড়েছে। শান্ত স্থির জলে আয়নার মত ভেসে উঠেছে আমার মুখের ছবি। আরে! আয়নায় মুখটা যেমন দেখায় এখানে তো তেমন দেখাচ্ছে না! জলে যার ছবি ভাসছে তার বয়স তো অনেক কম! কাঁচা চুল, চোখে ভারী কাঁচের চশমা নেই, গালের চামড়া একদম টানটান, এতো সেই কলেজ জীবনের "আমি"!

কলেজের দিনগুলোকে এভাবে ফিরে দেখার জন্যই "দর্পণ" এর আত্মপ্রকাশ। শতাব্দীপ্রাচীন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা প্রতিষ্ঠানের বয়ে চলা ইতিহাস। সেই স্বর্ণময় ইতিহাসের আকাশে সলমাজরির মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নক্ষত্র। তাদের চিন্তনের বিস্তৃত জগতকে দুই মলাটে আবদ্ধ করার প্রয়াস - 'দর্পণ'।

"দর্পণ" প্রাক্তনীদের খোলা মনের ক্যানভাস। কল্পনাকে মেলে ধরার সেই জানলা, যেখানে দৃষ্টি চলে বাধাহীন গন্ডিহীন মুক্তির উল্লাস নিয়ে। দর্পণের এই প্রারম্ভিক সংখ্যা সেই বৈচিত্রময় দৃষ্টিভঙ্গির এক ঝলক দখিনা বাতাস। যে বাতাস বয়ে আনে সংঘাত আর সমন্বয়ের পারস্পরিক সাহচর্যের বার্তা। উত্তরের বারান্দায় বসে কবি মন ভালোবাসার সৌরভ ছড়িয়ে দেয় সীমান্তের ওপারে। চেনা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দিন গুলোর কথা। বৃষ্টি শেষের আকাশে শরতের গন্ধ বয়ে আনে অন্য আগমনীর ধ্বনি। বহুদিন পরে খোঁজ পাওয়া কোন অনুঢ়া বন্ধুকে আশ্বস্ত করে মন - বন্ধু ভালো থেকো। সে বাতাসে কখনও ভেসে বেড়ায় চুরি যাওয়া পাহাড়ের গল্প, মানুষের জন্য মানুষের গল্প, কখনও বা পোষা বেড়ালটার গল্প। শুধুই দখিনা বাতাস নয়, "দর্পণ" সমৃদ্ধ হয় শিল্পীমনের তুলির আঁচড়ের প্রতিবিম্বে, জিজ্ঞাসু মনের গবেষণার প্রতিফলনে।

প্রাক্তনী সংসদের এই শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। অভিনন্দন সমস্ত প্রাক্তনীদের, যারা এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় সম্পদ। "দর্পণ" এর বিচ্ছুরিত আলোয় আরও উজ্জ্বল হোক ফেলে আসা অতীতের বর্ণময় স্মৃতি, আরও সুগম হোক আগামীর চলার পথ।

ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ
নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া।

সভাপতির কলম

নরসিংহ দত্ত কলেজ প্রাক্তনী এখন নেহাতই চারাগাছ। বিলম্বিত হয়েছে এর রোপন। ফলে শাখাবিস্তার করে কলেজকে অল্প অক্সিজেন দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া সবে শুরু হয়েছে।

"কোভিড" মহামারী আবার প্রাথমিক কাজ যেমন সদস্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থসংগ্রহ, কর্মসূচী গ্রহন ও রূপায়ন স্থগিত রাখতে বাধ্য করল, তবুও আমরা কয়েকটি Webinar, বিদায়ী ছাত্র - ছাত্রীদের সদস্যীকরন এবং একটি পত্রিকা প্রকাশের কাজ করতে সক্ষম হয়েছি।

এই মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি আসন্ন, এই আনন্দযজ্ঞে আমাদের ভূমিকা বর্তমানে ছাত্রদের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তার পূর্বে প্রাক্তন ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে প্রাক্তনীর মহীরূহ রূপটির রেখচিত্র তৈরী হবে।

আশা করি সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এই সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখবে এবং "দর্পণ" পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে পত্রিকাটিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

অভিনন্দন সহ,

সভাপতি,
অধ্যাপক ড. পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য
নরসিংহ দত্ত কলেজ অ্যালাম্‌নি অ্যাসোসিয়েসন্

Secratary's Desk

"Effort creates Action
Action creates Momentum
Momentum creates success".

My heartiest greetings to all of you.

With our effort I welcome the success of the first edition of Narasinha Dutt College Alumni Association Magazine "DARPAN". The Association is a registered Body since 2015. It is extremely sensitive and emotional event that sparks nostalgia among the alumni.

The onset of the journey evolves from the virtual meeting in Google Meet on 5.12.2020 with our Principal Madam Dr. Soma Bandyopadhya. From the stage of germination upto the blooming period of this magazine, I express my sincere gratitude to our Principal Madam for inspiring and encouraging us in every aspects giving us her valuable advice.

Our ex-students are spread across the state, outside the country, and in every nook and corner of the globe. Our primary object is to connect them, seek their advice and active participation to lead the Association to a great success.

This Magazine, not only upholds the evolving expertise of the alumni but witness the amalgamation of varied interests and thoughts in the form of Poetry, Short Story, Articles, Sketches etc among them.

I take the opportunity to thank all the alumni who have contributed their creations for the upcoming of this Magazine.

Thanks to the Teaching Faculty for rendering their kind co-operation whenever required.

The non teaching members deserve due credit for their help also.

Thanks to the Editorial team for their whole-hearted effort for the publication.

Lastly I thank the Publisher for his Co-operation and catering to our requirements.

It is my sincere request to all the alumni of this college to take active part by registering them as Member, and render their various fields of activities for the pride of the "Alma Mater"

Looking forward for your generous participation.

Dr. Lipi Das
(Secretary)
Narasinha Dutt College Alumni Association

Editorial

The Alumni Association of almost a Century old Institution is of great importance for the past, present and future students of the college.

Though the Alumni Association of Narasinha Dutt College was unfortunately formed rather late, its functioning because of COVID - 19, could not duly gather steam.

As a mark of our effort to involve the alumni even from their homes, we ventured into bringing out a magazine of the Association, 'DARPAN'.

The response we get is encouraging. "DARPAN" aims to reflect not only the mind and intelligence of the writers but also reflects on thousands of issues of public interest.

Through this first issue of the magazine we would thank all the contributors and also invite more and more participation of the alumni for a greater and better issue of the magazine

Editors
Dr. Purnendu Bhattacharyya
Dr. Rupali Dhara

প্রাক্তনীদের কাছে আবেদন

প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র / ছাত্রী,

আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

আমাদের এই "নরসিংহ দত্ত কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ খৃঃ, হাওড়া জেলার বেলিলিয়াস রোডে।এই মহাবিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শিক্ষার সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আসছে।

এই মহাবিদ্যালয়ে B.A, B.Sc. B.Com. General এবং Honours এর সাথে সাথে বর্তমানে Post Graduate শিক্ষাদানও প্রচলিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির বৃদ্ধি ও অগ্রগতির প্রতিফলনের সাথে, সাফল্য ও গৌরব অর্জনের বহু মাইল ফলকের মাধ্যমে, দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করেছে।

সম্প্রতি NAAC এর প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে মহাবিদ্যালয়টি B++ অর্জন করেছে। আমাদের এই কলেজে "নরসিংহ দত্ত কলেজ অ্যালাম্‌নি এসোসিয়েশান্" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 2015 সালে যার Registration No - S/2L/51524 of 2014.

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় শুধুমাত্র এই Alumni Association এর আবির্ভাব ঘটিয়ে আমাদের সব কার্য্য সমাপ্ত হয়না।এই কলেজ থেকে দীর্ঘ ৯৭ বৎসর ধরে বহু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষমতার মাধ্যমে বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।

সেই ক্ষেত্রে এই Alumni Association এর মাধ্যমে আমরা আবার সবাই একত্রিত হবার চেষ্টা করি যাতে পুরানো সেই দিনের কথা আমাদের মনের মনিকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে, কিছু কাজের মাধ্যমে আমাদের এই মাতৃশিক্ষায়তনকে, আরও সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

আমাদের উদ্দেশ্যঃ-

১. প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের জন্য একটি Data base তৈরী করা, সেখানে প্রাক্তনদের সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা যাবে।

২. আমাদের "আলমা ম্যাটারের" জন্য আর্থিক সহায়তার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনে একটি তহবিল নির্মান করা

৩. অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা, ইত্যাদি।

৪. সমস্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীর কাছে অনুরোধ তারা যেন আমাদের এই Alumni Association এর সভ্যপদ গ্রহণ করেন। এটি online বা offline দুভাবেই করা যায়।

এখানে General Membership - Rs. 250 এবং প্রতি বৎসর 100 করে renew করতে হবে।

Life Membership - Rs 2,000 only. এটি এককালীন প্রদেয়।

Online membership এর Link নিম্নে দেওয়া হল, সেটি শুধু Desktop বা Laptop থেকে করা যাবে।

Link for membership :
https://ndcollege.in/oscar

আমরা বিশ্বাস করি আমরা সকল প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী যদি আন্তরিকতার সাথে কাজ করি তবে আমরা একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবো।
সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে
ড. লিপি দাস
সম্পাদিকা

AN APPEAL TO THE ALUMNI

Dear Alumni,

As we know that Narasinha Dutt College is a premier College of Howrah with a glorisus record track since 1924.

Recently the College has been reaccredited and awarded B^{++} grade, by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC). The Alumni Association of this college is a Registered Body since 2015, stepping forward with large number of members.

In effect Alumni are viewed as life long commitment that do not end after graduation. They are the resources that can provide meaningful and mutual beneficial relationship over time.

It is my earnest Appeal to all our dear respected Alumni to Register themselves as a Member of the Association and become our active partners in the development of this college into a truely ideal Institute of Higher education.

The Registration fees are :-

1. General Membership - Rs. 250/- and Rs. 100 for yearly renewal.

2. Life Membership - Rs. 2,000 only for lifetime.

This can be done online or offline, but the online payment can be made only from Desktop or Laptop. The online Registration link is http://ndcollege.in/oscar.

It will give us immense pleasure to join hands together, to transform our dreams into reality by activity and Action.

Looking Forward for all your kind participation and Co-operation.

ROLE OF ALUMNI

1. The College offers the Alumni a strong platform for networking which will be mutually beneficial. It can be done through the Web page which will try to bridge the gap and provide a platform for all concerned.
2. The biggest Challenge is to create a Database of the Alumni. Keep us informed about your friends who are alumni of this College and provide us their contact nos / email Id, so that complete informations can be compiled for updating the database.
3. We look up to you fo mentoring and guiding the freshers, helping them for job placements and lot more valuable inputs.
4. Alumni can forward the details of any job opening or Business opportunities in their Organisation which can be posted in the Webpage for the benefit of the passout students.
5. Those belonging to Research Organisations could share a variety of resourses for the freshers.
6. Raising a corpus fund for Awards / Infrastructure / Financial support for deserving students of the "Alma mater"; is another major area where we seek voluntary contribution from our Alumni.

A College travelling since 1924 with a good member of Alumni, well settled in various aspects, if contacted would be glad to chip in voluntarily fo a good cause.

ACTIVITES PERFORMED

1. Fund raising and Membership Registration.
2. Life Membership has been introduced from 2020, which will provide a Life Membership Certificate also.
3. Investors Awareness Programme - 2016
4. A scholarship of Rs 30,000/- has been instituded for B.Sc (Bio) General Students by the Secretary Dr. Lipi Das
5. Audit has been completed till 2020.
6. State Level Webinar jointly with IQAC Conducted on 10.9.2021, where the resoursce person was our Alumnus Dr. Premananda Bharati (Indian Statistical Institute.)
7. Online Yoga workshop organised by Narasinha Dutt College and Institute of yoga Academy, Howrah, were conducted on 28th to 30th September and the instuctor was Jayashree Sarkar an almuna of our College.
8. Cleaning the playground of the college on 19th December, 2021.
9. Publication of the Magazine "DARPAN"

GOALS :-

1. Organise Health Care Camp for Students
2. Book Fair in the College Premises by the Publishers for the existing students.
3. Conducting Yoga and Karate workshop in the College for the students.
4. Organise a Blood Donation Camp.
5. Organise a Stem Cell Donation Awareness Camp.
6. Outsourcing Funds, etc.

Waiting for your kind involvement and co-operation.

Dr. Lipi Das
(Secretary)
Narasinha Dutt College Alumni Association

ALUMNI ASSOCIATION COMMITTEE - 2020

: ADVISORY COMMITEE :
CHAIRPERSON
Dr Soma Bandopadhya (Principal)
SECRETARY
Sri Sudhin Chatterjee

CORE COMMITTEE
: PRESIDENT :
Dr Purnendu Bhattacharjee

: VICE PRESIDENT :
Mrs Jayashree Sarkar
Sri Swapan Mondol

: SECRETARY :
Dr Lipi Das
: ASST. SECRETARY :
Dr Sukhendu Kanrar
Sri Proloy Mondol

: TREASURER :
Sri Santiram Santra

: CULTURAL SECRETARY :
Sri Prantik Sen

: MEMBERS :
Sri Krishna Kishore Mukherjee
Sri Tapan Paul
Sri Sanjay Sarkar

"LIFE MEMBERS"
OF NARASINHA DUTT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION
from 22.02.2020 - 31.12.2021

SL No	NAMES	YEAR OF PASSING
1.	Dr. Purnendu Bhattacharyya	1973
2.	Sri Sudhindranath Chattopadhyay	1974
3.	Dr. Lipi Das	1974
4.	Mrs. Anurupa Das	1981
5.	Mrs. Jayasree Sarkar	1986
6.	Mrs. Tultul Hazra	1987
7.	Sri Tapan Paul	1990
8.	Dr. Rupali Dhara	1993
9.	Sri Santiram Santra	1993
10.	Mrs. Mohua Mullick (Dutta)	1994
11.	Sri Gopal Chandra Senapati	1995
12.	Sri Sandip Kr. Adhya	1996
13.	Sri Prolay Mondal	1997
14.	Dr. Sukhendu Kanrar	1999
15.	Mrs. Nilanjana Roy	1999
16.	Sri Dhrubojyoti Chowdhury	2001
17.	Sri Sanjoy Sarkar	2002
18.	Dr. Anirban Sinha	2003
19.	Dr. Krishnendu Ghosh	2006
20.	Sri Amalesh Kanrar	2012
21.	Sri Ayan Bandopadhyay	2013
22.	Sri Kausik Dey	2015
23.	Ms. Sunetra Dey	2015
24.	Sri Debapriya Maity	2015
25.	Sri Pabitra Hazra	2018
26.	Sri Upansu Hazra	2018
27.	Sri Sukhen Das	

Cleaning of the College ground by Narasinha DuttCollege Alumni Association, in collaboration with NSS UNIT, on 19.12.2021.

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সংঘাত থেকে সমন্বয়	কিরন রায়	১
উত্তরের বারান্দা	চুমকী পিপলাই	৪
সীমান্ত	স্নিগ্ধা বিষ্ণু	৬
ভালোবাসা	অনীক দত্ত	৮
বৃদ্ধাশ্রম	সুস্মিতা আদক	৮
আমাদের ফেলে আসা সময়	সুপ্রতীম মুখার্জী	৯
কিসের আহ্বান	বিদ্যুৎ কোলে	৯
বন্ধু ভালো থেকো	কুলদীপ পোল্যে	১০
উচ্চারন	সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
গন্ধ	শ্রীলেখা দাস	১১
চেনা পথ	নীলাঞ্জন রায়	১২
প্রকৃত শিক্ষা	পিয়ালী দাস	১২
মিছিল	শুভেন্দু দত্ত	১৩
ঝড়	সুবীর সিন্‌হা	১৪
বিড়াল	রুপালী ধাড়া	১৫
এক পাহাড় চুরির গল্প	মহুয়া দত্ত	১৭
মানুষ মানুষের জন্য	শৌভিক চৌধুরী	১৮
আকাশময় বৃষ্টি	রাজেশ্বরী পাল	২০
অনূঢ়া	শ্রাবন্তী ঘোষ	২৫
অন্য আগমনী	কমলা ভানু	২৬
N S S	সাহিত্য রায়	২৯
রেখা চিত্র	স্বর্ণেন্দু ঘোষ	৩১
রেখা চিত্র	পিয়ালী দাস	৩২
Keeking Glass	Ranita Chakraborty	৩৩
A Strange New Year	Jhilik Santra	৩৪
Habitat Restoration Programme in Santragachi Wetland	Anirban Sinha	৩৫
A Tale of Audio Story	Soumen Ghosh	৩৯

“সংঘাত থেকে সমন্বয়”
(খ্রীষ্টিয় ১৩ শতক থেকে ১৫ শতক পর্যন্ত)

ভারতবর্ষে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার সমন্বয়বাদী চরিত্র সুপ্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের বুকে মুসলমানদের আগমনের বহু পূর্বে বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করেছিল, এবং নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর ও উন্নত সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। সুপ্রাচিন কালে আর্য সংস্কৃতির সাথে দ্রাবীর সংস্কতির মিলন ঘটেছিল। অতঃপর গ্রীক, শক, হুন ইত্যাদি জাতি ভারতবর্ষের বুকে পা রেখেছিল। তবে তাদের কোনো সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য না থাকার কারনে তারা এদেশের মাটিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে মধ্যযুগে মুসলমানদের ভারতে অনুপ্রবেশের পর এদেশে রাজনৈতিক কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘ্যদিন স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ইসলামীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির মিলন সম্ভব হয়েছিল।

ড. এল. মেহেতা লিখেছেন যে, “অভ্যন্তরীন ও বহিরাগত উপাদানের সমন্বয়ে উদ্ভুত নব্য সংস্কৃতির মাথে গঠনমূলক সমঝতা ধারায় বাহ্যিক প্রক্রিয়া থেকে সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে থাকে,” সুলতানি আমলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার রূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ড. মেহেতার এই মন্তব্য যথার্থ।

বস্তুত ভারতবর্ষে হিন্দু - মুসলমান সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া অতি সহজে ঘটেনি। ১৩ শতকে হিন্দু সমাজ ও কৃষ্টির প্রবল অস্তিত্বের মাঝে মুসলমানদের আগমন প্রাথমিক ভাবে ভারতীয় সমাজে এক উত্তেজক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। গ্রীক, শক, হুন সহ ইতিপূর্বে প্রভৃতি বিদেশি জাতিগুলি ভারতে আসলেও ইসলামের ন্যায় সুগঠিত জীবনধারা না থাকায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সহজ হয়নি। ইসলাম যখন ভারতে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা একটি সুগঠিত পরিপূর্ন জীবনধারা নিয়ে এসেছিল। তাই তারা সহজেই ভারতীয় ভিন্নধর্মীয় জীবনধারার সাথে বিলিন হয়ে যায়নি। সুলতানী যুগের বৃহত্তর দুটি জনগোষ্টির সম্পর্কের ধারায় ভারতীয় সমাজে তিনটি বৈশিষ্ট্যের অভিঘাত ও রূপান্তর দেখা যায়। যথা -

১। হিন্দু সমাজে প্রচলিত পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা।

২। নবাগত মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা

৩। হিন্দু - মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ী ধারা।

ভারতে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে নবাগত মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যেকার ভিন্নতা উভয়ের মধ্যেকার বিরোধের সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে পুরাতন হিন্দু সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রয়াস এবং নবাগত ইসলাম সংস্কৃতি ভারতীয় জনজীবনে ভিত্তি খুঁজে নেওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ভারতের সমাজ জীবনে উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেকার সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল। আচারানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও উভয় ধর্মের মধ্যেকার বিরোধ ও বৈপরীত্য স্পষ্ট। ইসলাম ধর্ম ছিল তত্ত্বগতভাবে একেশ্বরবাদী ও ভীষণভাবে পৌত্তলিক বিরোধী, সেক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম ছিল বহু ঈশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিক। ইসলাম রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুযায়ী কোনো ইসলামিক রাষ্ট্রের পৌত্তলিকদের বসবাস অস্বীকৃত ছিল। তাই তত্ত্বগতভাবে একটি মুসলমান রাষ্ট্রে পৌত্তলিক হিন্দুদের বসবাস করার অধিকার ছিল না, তাই স্বাভাবিকভাবে হিন্দুরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সংঘাতের পথ বেছে নেয়। কঠোর জাতিভেদ ও বৈষম্যে আবদ্ধ হিন্দু সমাজ সামাজিক সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ নিয়ে মুসলমানদের সাঙ্গীকরণ সহজ ছিল না। হিন্দুদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা ছিলেন ‘ম্লেচ্ছ’ এবং মুসলমানদের কাছে হিন্দুরা ছিলেন ‘কাফের’। পারস্পরিক এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা দুটি সম্প্রদায়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

কালক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিরোধের পাঁচিলটি বিভিন্ন কারনে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। অতি নীরবে ও ধীরগতিতে হলেও এই রূপান্তর ছিল প্রকৃত অর্থেই বৈপ্লবীক।

প্রসঙ্গত, জাতি-বর্ণ-ভেদাভেদ এবং সামাজিক বৈষম্যের আঘাতে রক্তাক্ত হিন্দু সমাজের হৃদয়ের অভ্যন্তরীন যন্ত্রণা সমকালিন সংকীর্নমনা ব্রাহ্মন সমাজপতিদের হৃদয় ব্যাথিত করতে পারেনি। যা হিন্দু সমাজের অন্তঃসারশূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, এবং রাজনৈতিক ক্রমরূপান্তরের মাধ্যমে এই শূন্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত, মুসলমানরা ভারতে আগমন করে এই জ্বলন্ত সমস্যাটির উপর ঘৃতাহুতি করেছিল। কারণ, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি ইসলামের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আরও বেশি করে নিয়ম-নীতি, আচার আচরণের কঠোরতা বৃদ্ধি করা হয়, যার ফলে হিন্দু সমাজে নারীদের স্বাধীনতা, সম্মান, অধিকার এবং মর্যাদার উপরেও ভীষণ রকমের আঘাত এসেছিল। বলা যেতে পারে এর দ্বারা হিন্দুরা কিছুটা হলেও

আত্মঘাতীর পথ বেছে নিয়েছিল।

এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমাজে মূলত নিম্নবর্ণের অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগনের একটি বড় অংশ স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম ধর্মের উদারতা ও সামাজিক সাম্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামে মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ক্ষেত্রে সমকালে রাজনৈতিক রূপান্তরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল। শরীয়ৎ বিধান অনুসারে একটি মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমানরা এবং 'অহল-ই-কিতাব' (যেমন - ইহুদি, খ্রিস্টান) ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব ও বসবাসের অধিকার স্বীকার করা হয়নি। এক্ষেত্রে পৌত্তলিক হিন্দুদের কোনো স্থান নেই। ইতিপূর্বে ইসলাম আইন বা 'শরা' ব্যাখ্যাকারি যে চারটি শ্রেনীর (হানাফি, মালাফি, শাফি এবং হানাবলী) উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে আবু হানাফি (৬৯৯-৭৬৬খ্রীঃ) -এর ব্যাখ্যাটি ছিল সর্বাধিক উদার। হানাফি বলেছিলেন যে, জিজিয়া প্রদানের বিনিময়ে একটি মুসলমান রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের বসবাস ও তাদের নিরাপত্তা-প্রদান কোরান অনুমেয়, আর ভারতে আগত সিংহভাগ সুলতানই আবু হানাফির ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন। ফলে মুসলমান শাসনাধীন রাষ্ট্রে পৌত্তলিক হিন্দুদের বসবাসের আশঙ্কা দুর হয়।

প্রাথমিকভাবে ভারতে মুসলমানদের সাম্রাজ্যকে একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র হিসেবে মনে করা হলেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এর স্বতন্ত্র চরিত্র উঠে আসে। আলিগর ঐতিহাসিক ড. আশরাফ যুক্তি বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, পবিত্র কোরাণ বর্ণিত ধর্মরাষ্ট্র এবং ভারতে প্রতিষ্ঠিত সুলতানি রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল। তাঁর মতে, পুঁথিগত ভাবে সুলতানরা খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করলেও তারা অবাধ ও সার্ভভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকতেন। নিজনামে মসজিদে 'খুদবা পাঠ' ও 'মুদ্রা' প্রচলন করতেন। আর সমকালে শরীয়ৎ আইনের ব্যাখ্যাকারি হিসেবে ও সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবে "উলেমারা" ছিলেন সর্বোচ্চ। তাই তাদের উচ্চপদে নিয়োজিত করার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। বাস্তবে দেখা গেছে যে, সুলতানের ইচ্ছার উপর উলেমাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা নির্ভর করত। অপরদিকে খলিফার অনুমোদন লাভের দ্বারা সুলতানরা তাদের সাম্রাজ্যকে আদর্শগত ভিত্তি দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে তা ছিল সম্পূর্ণ প্রয়োজনভিত্তিক, আদর্শভিত্তিক নয়। ড. কে.এম. আশরাফের মতে. " কোরানের রাজনৈতিক আদর্শ যতই উদারভাষ্য হোক না কেন; রাজশক্তির এরূপ নির্লজ্জ স্বৈরাচারিতা সাথে কখনোই মেলানো যায় না।

প্রকৃতপক্ষে দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্যের সার্বিক ক্ষমতাসীন। খলিফার অনুমোদন কিংবা উলেমাদের প্রাধাণ্য দেওয়া সুলতানদের কাছে একটি তাৎখাণিক প্রয়োজন ভিত্তিক কাজ ছিল।

দিল্লির সুলতানরা ধর্ম ও রাজনীতি দটি পৃথক সত্ত্বা হিসেবেই দেখতো বলে মনে করা যেতে পারে। বেয়ানার কাজি মুমিসউদ্দিন-এর সাথে আলাউদ্দিন খলজির আলোচনা প্রসঙ্গে মুমিসউদ্দিন পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর ধর্মের প্রভাবকে স্বাভাবিক বলে বর্ণণা করলে আলাউদ্দিন প্রকাশ্যেই বলেছিলেন - "I don't know whether this is lawful or unlawful; whatever I think to be good of the state or suitable for the emergency that of decree ....."

নাসিরুদ্দিন চিরাগ ও আমির খসরুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ''আলাউদ্দিন মুসলমান শাসক ছিলেন; মুসলমানদের নয়।' রাজতন্ত্র সম্পর্কে গিয়াসুদ্দিন বলবন নিজেকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারি হিসেবে মনে করতেন। ইলতুৎমিস খলিফার অনুমোদন প্রার্থী থাকলেও তিনিও মনে করতেন যে, " সাম্রাজ্যের পূর্ণতা দুনিয়াদারিতে; দিনদারীতে নয়"। মহম্মদ-বিন-তুঘলক খলিফার অনুমোদন লাভ করাকে আবশ্যিক মনে করতেন না। তিনি উলেমাদের ধর্ম বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে তাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করতেন।

বস্তুত দিল্লির মুসলমান সুলতানরা বুঝেছিলেন যে, বহুত্ববাদী ভারতবর্ষে ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাজ্যশাসন করা সম্ভব নয়। তাদের ক্ষমতার উৎস ও ভিত্তি ছিল ''সামরিক বাহিনী'' ও ''ব্যক্তিগত দক্ষতার'' উপর। মজার বিষয় হল এই যে, দিল্লির সুলতানরা উলেমাদের পাশে বসিয়েই রক্ষণশীল সিদ্ধান্তগুলি বিচক্ষণতার সাথে এড়িয়ে যেতেন। ড. সতীশচন্দ্রের মতে, ''জিজিয়া করের মাধ্যমে কিংবা তরোবারির ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হত না। তাই উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে সুলতানি আমলের ভারতরাষ্ট্রকে কিছুটা 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে ধর্ম-নিরপেক্ষতার পরিবেশ তৈরি হওয়ার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটার পথ প্রশস্ত হয়।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিবিধ উপাদানের পাশাপাশি ঐতিহাসিক মহলের একটি বড় অংশ মনে করেন যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে

সহনশীলতা হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে আত্মীকরণ প্রক্রিয়াটিকে তরান্বিত করেছিল। সামাজিক সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ তত্ত্বগত ভাবে ইসলাম ধর্মে থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও শ্রেণীগত বিভেদ বর্তমান ছিল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি ইসলামের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিয়ম-নীতি ও বিধি-নিষেধের কঠোরতা বৃদ্ধি করেছিল। একইভাবে মুসলমান গোঁড়াপন্থী ও শাসকশেণী তাদের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব রক্ষার তাগিদে অহংসর্বস্বতা জাহির করতে থাকেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এই দুটি চরমপন্থী ধারাই অসার প্রতিপন্ন হয়। তথাপি উত্থান ঘটে তৃতীয় ধারাটির। আর এই তৃতীয় ধারাটির মূলে ছিল 'সুফিবাদ' ও 'ভক্তিবাদ', এই দুই উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু দর্শনেই প্রেম, ভালোবাসা ও ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের কথা বলা হয়েছে। উভয় দর্শনে একেশ্বরবাদী ধারণাটির প্রযোগ ঘটেছে। উভয় দর্শনের মূল অবদান ছিল 'সামাজিক সচলতা' বা 'ঝড়পরধষ গড়নরষরঃ', সুফি দর্শনের নেতৃত্বে 'ইসলাম ভারতীয়করণ' (Indianisation of Islam) সম্পাদিত হয়। সুফিবাদের উপর পরোক্ষ ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু যোগীদের প্রভাব ছিল। সুফিদের 'দরগা' বা 'খানকা' - গুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার ছিল । গুরু বা পীর তার শিষ্য বা মুরিদদের 'জীবনমূখী শিক্ষা' প্রদান করতেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান সুফিও ভক্তিবাদের আদর্শে আকৃষ্ট হতে লাগলেন এবং জীবনমূখী আদর্শ লাভ করার মাধ্যমে সমাজে নিম্নবর্ন অবহেলিত ও অস্পৃশ্য মানুষরাও যথেষ্ট সম্মান অর্জন করতে পারলেন। এই দুই দর্শন হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের ব্যয়বহুল ধর্মাচরণ, বৈষম্য ও ভেদাভেদকে অস্বীকার করে।

সুফি ও ভক্তি দর্শন ছিল, 'অতিন্দ্রিয়বাদী', কৃষ্ণ, শিব, রাম, আল্লাহ্ সবাই ভক্তিবাদে হৃদয় মন্দিরে একাকার হয়ে বিরাজ করেন। ভক্তিবাদে 'সত্ত্বার ঐক্য' (Unity of Being) গড়ে তোলা ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ধর্মীয় ক্ষেত্রে গোঁড়ামির পরিবর্তে উদার ও সহনশীলতার পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে উভয় ধর্ম- সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সহনশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল ফলে বহু মানুষ অতিন্দ্রিয়বাদী দর্শনকে গ্রহণ করেন।

অনুরূপ ভাবে সাহিত্য ও শিল্প-শৈলীর ক্ষেত্রেও এই সমন্বয় ছিল অব্যাহত। মুসলমানরা কালক্রমে হিন্দি ভাষা গ্রহণ করতে শুরু করে। যার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ আমীর খসরু। কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে সৈয়দ ও লোদীদের আমল পর্যন্ত নির্মিত শিল্পশৈলীতেও এই মিলন অবিরাম ছিল। মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে, চৌকাট খিলানের পাশাপাশি তির্যক খিলান ও গম্বুজের সহাবস্থান " ইন্দো - পারসিক শিল্পরীতি " -র জন্ম দেয়।

'আলাইদরওয়াজা'-য় অর্দ্ধ গোলাকৃতির খিলান ও চিত্র-বিচিত্র অলঙ্করণ গোঁড়া ঐসলামিক পরম্পরা থেকে আলাদা করেছে হিন্দুদের প্রতীক পদ্মফুলের সাথে পারসিক নকশা, লতা পাতার সর্পিল অলঙ্করণ একাকার হয়ে যায়। বাংলার প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে, "মুসলমানরা যেই স্থান থেকেই আসুক না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হইলেন। মসজিদের পাশে দেবমন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল, রামায়ন - মহাভারতের কথা মুসলমানদের আকৃষ্ট করিল, বাংলা প্রায় তাদের মাতৃভাষায় পরিণত হইল।"

তবে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে একেবারেই যে অসহিষ্ণুতা ছিল না, একথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাদা - কালো উভয় চিত্র থাকলেও পরিশেষে বলা যায় যে, একেবারে গোড়ার দিকে হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে যে রূপ আক্রমণাত্মক এবং পারস্পরিক সংঘাতের সম্পর্ক ছিল, দীর্ঘদিন পাশাপাশি অবস্থানের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক , ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রূপান্তরের হাত ধরে উভয়ের মধ্যেই সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়; যা ছিল প্রকৃত অর্থেই বৈপ্লবিক।।

তথ্য সূত্র ঃ-

1. Ashraf, K.M. Calcutta 1935 - "Life and Condition of the People of Hindustan. " (1200-1550)
2. Habib, Md. 1965 - "The Political Theory of Sultanate of Delhi."
3. Nizami, K.A., Mumbai, 1961 - " Religion and Politics in India During the Thirteenth Century."
4. রামশরন শর্মা, কলিকাতা, ২০০৩ - " আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ "

— কিরণ রায়
ইতিহাস, ২০১৬

॥ উত্তরের বারান্দা ॥

খড়গপুর আই. আই টি র মধ্যে মেয়ের ক্ষনিক আবাস থেকে NFA কোয়ার্টারে যখন এসেছিলাম তখন বারান্দা থেকে উত্তরের ছোট্ট বনাঞ্চলে গাছেরা ছিল পত্রহারা। তাদের শুকনো ডালে ঠোকাঠুকি ছিল, পাখিরা সেখানে পাতার আড়ালে মুখ লুকাতে পারছিলনা। সামনের শিরীষ গাছের ডালে কাঠঠোকরা একমনে পোকা খুঁজে চলেছে, হাঁড়িচাচা পাশের ডালে বসেই আপন মনে সাথীকে ডেকে যাচ্ছে। ও পাশের মহানিমের ডালে বসে এক ঝাঁক ছাতারে ঝগতাড়ে ব্যস্ত। দূরে কোথায় বৌ কথা কও ডেকে উঠলো, বাঁ দিক থেকে এক মেয়ে সুরে একটা কোকিল ডেকে যাচ্ছে। পাতাবিহীন জঙ্গলের একটা অন্যরূপ আছে। তার শুষ্ক খয়েরী ঘেরাটোপের ফাঁক দিয়ে দূরে কোন গ্রামের নারকেল গাছ উঁকি দিচ্ছে। ভরা জঙ্গলে নজর পড়েনা এমনি দু'একটা বাড়ীর ছাদ কিম্বা রঙ দেখা যাচ্ছে।

ক'দিন পর বাতাস ছুটে নিয়ে এলো মেঘ আবার পরে এলো ঝড় তার সাথে টুপটাপ বৃষ্টি। পরে তা ঝরো ঝরো ঝরে প্রকৃতিকে ঠান্ডা করে দিয়ে গেল। বারান্দায় বসে দেখলাম ঝোড়ো হাওয়ার সাথে বর্ষার দ্যোতনা। কদিন পরেই তাকিয়ে দেখি গাছের পাতায় চিকন সবুজ।

রোদ ওঠার আগে থেকেই পাখীদের আনাগোনা। দোয়েলের শিস, বুলবুলিদের পাখা ঝাপটানি, নীচে শালিক পাখীর জটলা। আর কাঠবিড়ালির ছোটাছুটী। দুটো কোকিলের দুধার থেকে কুহু - কুহুর বিরাম নেই। পাঁচিলের ধারে ন্যাড়া অমলতাসেরও কচি সবুজ পাতা জেগেছে। অমলতাস চেনো, যাকে সাদা বাংলায় বলে বাঁদর লাঠি। হু, এটাও কিন্তু ওষধি গাছ।

আমাদের শোয়ার ঘরের জানলার পাড়ে এক টিয়া দম্পতির ছানা হয়েছে। তাদের কচি কচি ডাক শোনা যায়। বারান্দা দিয়ে দেখতে পাই মা - বাবার খাবার বয়ে আনা। তার কদিন পরেই ছোট ছানাদের নিয়ে উড়ান শেখার প্রচেষ্টা। হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো, তারা আর নেই। কিছুদিন পরে হাঁড়িচাচা দম্পতির সংসার। বঙ্কিমবাবুর ভাষায় কোকিলের থেকে হাঁড়িচাঁচা ভাল। সত্যিই তাই কি সুন্দর দেখতে ওদের। লম্বা লেজটা হলুদ খয়েরিতে চিত্রন করা। পাখনা মেলে যখন উড়ে যায় কি ভাল যে দেখতে লাগে।

বর্ষার জল পেয়ে সমস্ত গাছগুলো সবুজ আবরনে ডেকে গেলো। শিরিষ, রাধাচূড়া, নিম, মহানিম, জারুল, জাম আরো কত নাম না জানা গাছ। দূরের রাধাচূড়ায় হলুদ ফুলের আলপনা। কাছের একটা গাছের লালচে পাতার বাহার কিছু দিন পরে আবার সেটা সবুজ হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে একটা খেজুর গাছে হলদে - কমলা খেজুরে ভরে গেলো। পাখী আর কাঠবিড়ালিদের কি আনন্দ।

রোজ সকালে আর বিকেলে চেয়ার নিয়ে এই বারান্দায় এসে বসি। দুটি বেলার বৈচিত্র দু'রকম। সকালের নরম রোদে পাখীদের চঞ্চলতা অন্য ধরনের। আমি যখন উঠি তার অনেক আগে থেকেই তাদের দিন শুরু হয়ে গেছে। শালিক, বুলবুলি, দোয়েল, পায়রা, ছাতারে, ফিঙে, হাঁড়িচাচা, বৌকথা কও, ঘুঘু, কাঠঠোকরা এমনকি গভীর জঙ্গলে বসে কুব কুব করে যে কুবো পাখী ডাকে তাদেরও প্রথম পর্বের শেষ। তারা কেউ ঝগড়া করতে ব্যস্ত, কেউ আপন মনে শিষ দিতে, কেউ বা উড়ন্ত থেকে বসন্ত হতে থাকছে।

শিরিষ গাছের ডালে একটা বসন্তবৌরী ছোট্ট গলা থেকে ভারী শব্দ করে ডাকছে আর ঠোঁট দিয়ে গাছের ডালে ঠকাঠক্ করে চলেছে।

এরপর এলো একদিন তুমুল ঝড়, পশ্চিম দিক থেকে কালো মেখে ঢেকে গেল আকাশ। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে দরজার মুখে বসলাম। গাছেরা পাল্লা দিয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, শুয়ে পড়ছে। তার সাথে মুষলধারে বৃষ্টি, বিদ্যুত চমকানো আর বজ্রপাত। মনে মনে স্মরি 'যখন গহন রাত্রি ঝরিছে বারিধারা' না, রাত্রি নয় সবে বিকেল থেকে সায়াহ্নে এসেছি। দক্ষিন - পূর্ব দেখছি না, উত্তর - পশ্চিমের দ্রুত বেগে হাওয়া আর ঝমাঝম বৃষ্টি যেন অবাক বিস্ময়ে ভরে তুলেছে । কবে কোন ছোটবেলায় জানলা দিয়ে এক চিলতে আকাশের বৃষ্টি নামা, কিম্বা সরু গলির ফাঁকে ঝমাঝম্ বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ এ দিনের বর্ষনকে মহান করে দিল। বৃষ্টি থামতে দেখি পাতায় ভরা, ফুলে ধরা রাধাচূড়ার অধঃপতিত হয়েছে।

কদিন পরে সকাল বেলায় রোদে বারান্দায় এসে দেখলাম অমলতাস হলুদ ফুলের ঝুড়িতে হাসছে। ছোট গাছ কিন্তু তার সারা মাথা ভরে আছে ফুলে ফুলে । শুধু তাই নয়, তাকে ঘিরে শুধুই হলুদ প্রজাপতিরা ভিড় করে আছে। এ যেন এক পরম পাওয়া। বলি 'প্রভাতে উঠিয়া এ ফুল হেরিলাম দিন যাবে মোর ভাল'।

আজ আর সেই উত্তরের বারান্দা নেই। এক আস্তানা থেকে আমরা এসেছি অন্য আস্তানায়। মনে পড়ছে সকালে কুবো পাখীর ডাক, ছাতারের ঝগড়া, পায়রার বকবকম, বৌকথাকও এর দোল খাওয়া, দোয়েলের শিস্ হাঁড়িচাচার উড়ন্ত চপলতা, মৌটুসি, বী - ইটারের ফুলে ফুলে মধু খাওয়া, হরেক রকম প্রজাপতির পাখনা মেলা। এটাই শুধু নয় মনে জাগছে রাধাচূড়া, মহানিমের পাতা দোলানো, অমলতাসের

হলুদ বাহার, আরো কত নাম না গাছের চঞ্চলতা। কাঠবেড়ালির ব্যস্ততা, শালিক - ছাতারের ঝগড়া।

এই নতুন আস্তানাতেও রয়েছে উত্তরের বারান্দা। এখানে জঙ্গল নেই বটে, কিন্তু প্রাঙ্গনের ধারে ধারে অনেক গাছ। সেগুন, কদম, আম, জারুল, আরো অনেক গাছ। এখানেও পাখীরা আসে তবে ওই বারান্দাটা যেন আরো ভাল ছিল। এখানে দেখি ছোট ছোট গাছের নীচে দিয়ে ডাহুক আর কুবো পাখীর আনাগোনা। বড় গাছে শালিক আর ছাতারের ঝগড়া ওখানের মতই। ছাতারে বড়ই ঝগড়াটে কাউকেই তাদের চৌহদ্দীতে ঢুকতে দেয়না। একটা চিৎকার করলেই সবাই এসে তার সাথে যোগ দেয় আর কাক, শালিক বা টিয়া যারাই থাক না তাদের তাড়িয়েই ছাড়ে। তেঁতুল গাছের মাথায় একজোড়া বিদেশী পাখী - 'ওরিয়ল' এসেছে। কদিন পরেই তাদের ছানা হলো "প্যারাকীট"। বেশ বড় সাইজ আর লাল মাথা, বুকের মাঝখানটা কালো সাদার ডোরা, ভারী অদ্ভুত। আর একটা পাখী দেখা গেছে সাদা রঙের, বেশ বড় লেজ, নাম তার দুধরাজ। এ সব পাখীর নামই শুনিনি কখনও, দেখাটা তো দূরস্থান। একদিন নীচের আঙিনার মাঝারি গাছে থেকে একটা অদ্ভুত ডাক ভেসে আসছে। অনেকক্ষন ধরে লক্ষ্য করে দেখলাম সাদার মধ্যে কালো ফুটকি এক অদ্ভুত দেখতে পাখী। কোকিল না ঘুঘু ভাবতে ভাবতে গুগুল সার্চ করে দেখা গেলো ওটা মেয়ে কোকিল, তার পাশেই আর একটা গাছ থেকে কুহু করে ডেকে তার পাশে এসে বসলো তার দোসর। আমরা আস্বস্ত হলাম কোকিল দম্পতিকে দেখে।

পরে একদিন দেখলাম ছোট গাছে ভরা জঙ্গলটিকে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কত নাম না গাছ, সবাই নিকাশ হয়ে গেছে। মন খারাপ হয়ে গেলো। ওটা হয়তো আবাসিকদের কিচেন গার্ডেন হবে। তাই হর্টি - কালচার থেকে পরিষ্কার করে গেছে।

এই উত্তরের বারান্দা থেকে দেখা যায় দূরের একটা ন্যাড়া গাছে, কাক আর শালিকদের শেষ বিকেলের রোদ পোহানো। আর একটা গাছে নানা পাখীদের জটলা আর নিজেদের সুরে গান। ওপরে আকাশ দিয়ে বকের সারি। একটু নীচে টিয়ার ঝাঁক এদিক ওদিক করছে। ফিঙে, চাতক উড়ে যাচ্ছে, আকাশের মেঘ, হলুদ থেকে, লাল, কমলা আর গোলাপী হয়ে গেল। তার পর ঝুপ করে আঁধার নামে।

এখন শীতের মরসুমে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া, রোদের আসা - যাওয়া কম। তবে ওখান থেকে পাশের বাড়ীর বাগানে দেখি মরশুমি ফুল আর সবজি গাছের সমাহার। সবুজ বাগানটা দেখলেও মন ভরে যায়। সেগুন গাছে ফুল ধরেছে বিশাল একটা কুল গাছ ফলে ভরে রয়েছে। পাখী আর কাঠবেড়ালির ছোটাছুটির মহাধুম। উত্তুরে হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও কনকনে ঠান্ডার রেশটা বেশ ভালই লাগছে। কদিন পরে আবার আসবে ফাগুন হাওয়া। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মনে ভরে থাকবে অমল আনন্দে।

ড. চুমকী পিপলাই,
নৃবিজ্ঞান, ১৯৭০

॥॥॥ সীমান্ত ॥॥॥॥

আমি পূর্ববাংলার মেয়ে,
দাঁড়িয়ে আজ এপারের সীমান্তে...

বহুদিন পরে আজ বাবার সাথে দেখা হবে!
.."ওপারে চেনালোক আসবে, একটু সামনে যেতে পারি?"
অনুরোধের সাড়া মেলে-"বেশীক্ষনের জন্য নয়।"
জড়তামাখা ভীরুপায়ে অবশেষে পৌঁছানো..
সামনে লোহার গ্রীল, -ওপাশে যাবেনা যাওয়া!!

মাথার উপরে তীব্র রোদ,
আর ভিতরে অশান্ত হৃদয়, উদ্বেগেত্তর;
সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়না, সামনে যে লোহার বেড়া।
তাই খন্ড -বিখন্ড চোখে দেখা
ওই যে সামনে তার একান্ত আপন জন্মভূমি!!
কিন্তু আজ..? অন্য দেশ যে!!

কে কাকে ত্যাগ করেছে?
দেশ তাকে? নাকি সে মাতৃভূমিকে? -বুঝতে পারেনা আজও!!
ওপারের একটু মাটি ছোঁয়ার কী আকাঙ্ক্ষা বুকের মাঝে!... কিন্তু অনুমতি নেই ওপারে যাবার!!
শুধু তৃষ্ণার্ত দুচোখে রয়েছে ওপারে.. ওই ভীড় করা মানুষের ভীড়ে...;
আজ তার বাবার আসার কথা যে!!

সাদা শার্ট পরা ওই দূরে হাত নাড়ছে কে? বাবা কি?
ওই যে নীল শার্ট পরে একজন! বাবার তো ওইরকমই একটা শার্ট ছিল!
মুখগুলো সব ঝাপসা লাগে!
শুধুই উদ্বেগের অপেক্ষা...
মুহূর্ত যেন এক যুগ..
বাবা এখনো কেন এলো না!

হঠাৎই ও-ই তো বাবা!
ওই যে করুনভাবে অনুমতি চাইছে হয়তোবা একটু সামনে এগিয়ে আসার জন্য!
হ্যাঁ.. ও-ই তো বাবা.. এসে গেছে..

বহুলোকের সমাগম,
তার ই মাঝে দু'জন আজ দু-দেশের প্রতিনিধি!
মাঝে লোহার গ্রিল, কিছু বি. এস. এফ...
দু-পাশে পিতা ও কন্যা, বিপরীতমুখী...
বে

জলে ঝাপসা দু'চোখ পিতার,
কম্পিত হাত ধীরে ধীরে গ্রিলের মাঝ দিয়ে কন্যার মাথায়,.. কাঁপা গলায় প্রশ্ন 'কেমন আছিস মা?'
ঠিক প্রশ্ন নয়... অনেকটা কৈফিয়ৎ-এর মতো লাগে যেন!
কম্পন ছড়িয়ে পরে পিতার হাত থেকে কন্যার মাথায় আর্শীবাদের মতো;

কোন কথা নেই,
চলমান পৃথিবীটা হঠাৎই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে!
সমস্ত প্রকৃতি যেন বোবা চোখে তাকিয়ে আছে,
দেখছে এ বিচ্ছেদময় মিলনদৃশ্য..
মুহূর্তের জন্য যেন সবকিছু থেমে গেছে!

শুধু চোখের জল বাঁধা মানে না..
সে ঝরে পড়ে অঝোরে, পিতার স্নেহের স্পর্শে.....

..হয়তো বা প্রশ্ন জাগে মনে -
কেন এ অভিশাপ???

স্নিগ্ধা বিষ্ণু
উদ্ভিদ বিদ্যা - ১৯৯২

ভালোবাসা

ভালোবাসার সংজ্ঞা দেওয়াটা খুব কঠিন
মুহূর্তে বদলায় ভালোবাসা।
আজ এক,
কাল অন্য,
পরশু হয়তোবা আরো কিছু।
বদলায় না শুধু ওই ঘর।
দিনের শেষে বা শুরুতে,
ব্যস্ততায়, অবকাশে,
একচিলতে আশ্রয়
ওই ঘর।
দুপুরের আলগা আলসেমিতে
বা সন্ধ্যের রঙিন মায়ায়
থাকে শুধু ওই ঘর।
আর ঘর যে শুধু চার দেওয়ালের, তা নয়
ঘর তো রক্ত মাংসেরও হয়।
জলজ্যান্ত দিব্যি একখানা ঘর।
সবার থাকে না।
কেউ নিজের ঘরেও পর
কারুর আবার পরেরটাই ঘর।
তাই বলছি
ভালোবাসা মানে ঘরটাই বুঝি।

— অনীক দত্ত
Computer Science, 2009

বৃদ্ধাশ্রম

এতদিন যাকে কোলে পিঠ করে করলে মানুষ।
দিনে দিনে সেই সন্তানরা হয়ে উঠছে অমানুষ।
সন্তান অসুস্থ হলে ছেলেবেলায়, তোমরা করতে সেবা।
আর আজ বৃদ্ধবেলা তোমরা,
সেই সন্তানদের কাছেই হয়ে উঠেছে বোঝা।
নিজে না খেয়ে যাকে খাওয়ালে,
সেই আজ নিজে খেয়ে তোমাদের অভুক্ত রাখলে।
অথচ এই সন্তান যখন ছিলো ছেলেমানুষ
তোমরা তো তাকে মাথায় করে রাখতে।
কিন্তু আজ যখন তোমরা হলে ছেলেমানুষ,
সেই সন্তান তো তোমাদের পায়ের কাছেও রাখলো না।
ছেলেবেলায় সন্তানের করা ভুলকে,
তোমরা বলতে ছেলেমানুষী।
আর আজ বৃদ্ধবেলায় তোমাদের করা সামান্য ভুলকে,
সন্তানেরা বলে বুড়ো বয়সে ভীমরতি।
আজ সন্তানেরা থাকে এসি রুমে,
আর বৃদ্ধ বাবা মার জায়গা হয় বৃদ্ধাশ্রমে।
আচ্ছা! একেই কী বলে নবযুগের সভ্যতা,
নাকি বৃদ্ধ বাবা মার প্রতি সন্তানের করা " অসভ্যতা " ?

— সুস্মিতা আদক
Bengali (Hons.), 2018

আমাদের ফেলে আসা সময়

যারা স্মৃতি রেখে গেছে তাদের জন্য স্মরণিকা রেখে যাও,
হারিয়েছে যারা মানুষের কোলাহলে, তাদের জন্য একমুঠো
রোদেলা বিকেল পাঠাও।
বন্ধু শব্দটা ভারী হয়ে যায়,
বদলে যায় চেনা সময়- শহর জুড়ে শীত নেমে আসে;
হিম জমা হয় কার্নিশে, গূঢ় হয় বিষাদ- বিচ্ছেদের উল্লাসে।
তুমি ফেরো, ফিরে এসো অন্যভাবে,
কংক্রিট পাঁজরের মাঝে, নিজেকে চিনে নাও।
চেনা মাঠ-ঘাসের আগায় শিশির,
ক্যান্টিন-উল্লাসে ক্লাসরুম শূন্যতায় স্মৃতির ভিড়
আয়োজন ছেড়ে পুরনো মুহূর্তরা বেঁচে ওঠে, ভেসে ওঠে।
ভেসে আসে অর্জুন-শিমূলের চেনা কোরাস- দরজা বন্ধ হওয়ার আগে ফিরে তাকাও।
ভালো থাকার অভ্যেস শিখে নিতে হয়,
হাজার পাথুরে ক্ষতে প্রলেপ দেয় সময়,
তুমি নদীর মতো বয়ে যাও-
শেষ বিকেলে চেনা পাথরে ঢেউ এঁকে যাও।

— সুপ্রতীম মুখার্জ্জী
উদ্ভিদ বিদ্যা, ২০১৫

কিসের আহ্বান

ঝড়ের সংকেতে,
ঝরা পাতাদের উল্লাসে,
চুপ হয়ে গেছে সাঁঝের তারাও।
চেতনা তখনও বিবেকের
ঠিকানা পেয়ে মরিয়া-
অট্টহাস্য করে সুপ্ত আত্মা।
পথহারা পথিকের ক্লান্তিতে,
ঝরে পড়ুক রাশি রাশি সাদা ফুল।
সন্ধ্যামালতী লাজে রাঙা।
অপরূপা রাত্রির আহ্বানে,
দু-একটা জোনাকি,
নিশাচরের ভয়ে ভীত।
শেয়ালের হুঙ্কারে কিসের সতর্কতা ?
নিঃসঙ্গ পথে ঘুরে মরে
একটা পথ কুকুর।
রাস্তার আলোয় কত মুখোশ,
রাতজাগা অস্পষ্ট আনাগোনা।
কুয়াশায় ঢেকে গেল সব,
রহস্যের কালচক্র।
চেতনাহীন কিসের আহ্বান যেন -
ওই শোনো - কান পেতে।।

— বিদ্যুৎ কুমার কোলে
উদ্ভিদ বিদ্যা, ১৯৯৪

বন্ধু, ভালো থেকো

বন্ধু, ভালো থেকো।
তুমি হয়তো ছোটগল্প কিংবা একটা কবিতা।
হয়তো উপন্যাস, নয়তো আমার গোটা খাতা।
ঘুম-না-আসা রাতের, অগোছালো অজানা যত কথা-
এঁকেছি যত্ন করে, অন্তরের সেই রঙিন বর্ণমালা।
একদিন যদি যাই চলে অনেক দূরে-
স্বপ্নের উড়োজাহাজ নিয়ে, যদি আর না ফিরি তবে-
থাকবে ছোটগল্প, থাকবে আমার কবিতা।
থাকবে উপন্যাস, হয়তো একটা জীর্ণ খাতা।
খুঁজলে পাবে অনেক চেনা কথা-
রঙিন বর্ণমালার ফ্যাকাসে সব আঁকা।
বন্ধু, তুমি শুধু ভালো থেকো।

— কুলদীপ পোল্যে
B.Sc. (General), 2013

উচ্চারণ

বহুবার পুড়িয়েছি এই দেহ
বহুবার রেখে এসে চিতার ওপর
বহু স্পর্ধায় হেঁটেছি স্লোগানে মিছিলে
জেনে আগুনই সব অক্ষমতা নাশে।

বাকি সব গেছে বিদ্বেষে, বিভ্রমে
রং বদলের পোষ্টারে পোষ্টারে
ওষুধ তবু তো একটাই আজো আছে
জখম সারাতে স্বপ্ন বুনেছি ভোরে।

আমরা বুঝিনা নির্বাসনের গল্প
শিকড়ের ঘ্রাণ চিনে নিতে তাই সোচ্চার
বৃষ্টির হাত ধরে পাশাপাশি বন্ধু
মরা নদী বুকে নেমে আসবই বারবার

হাজার বছর বাঁচুক এই বিশ্বাস
এ মাটি আমার তোমার ও যে সেই মত
হাত মিলে গেলে জুড়বেই সব সাঁকো
সব রং মিলে একটাই রং আঁকো।

— সোমা বন্দোপাধ্যায়
B.A. (General), 1990

“গন্ধ”

কদিন ধরে একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে আসছে,
তাই বাড়ির ভেতর ও চারপাশটা ভালো করে পরিষ্কার করলাম।
তাও তীব্রভাবে সেই গন্ধটাই নাকে আসছে।
গন্ধটা এতোই বিশ্রী যে ঘরে থাকাই আমার কাছে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গন্ধটা ঠিক কেমন তোমাদের বোঝাতে পারবোনা।
পচাগলা মৃতদেহের গন্ধ, আবার রক্তমাখা শরীরের গন্ধ,
জ্বলন্ত আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার গন্ধ, আবার বৃষ্টির জলে-জমা পচা গন্ধ
এইসব মিলে মিশে একাকার করা এই বিশ্রী গন্ধে আমার দমটা বন্ধ হয়ে আসছে।
কী বললে, আমি পাগল হয়ে গেছি?
আরে না না আমি পাগল হইনি,
তোমাদের নাক মুখ আসলে ওই মাস্কে ঢাকা
তোমাদের নাকে সেই গন্ধ আসছে না।
এই মহামারিতে তোমরা বেআইনি ভাবে এই লাশ পাচার করছো,
সেই মৃত মানুষগুলোর পচা দেহের গন্ধই আমি পাছি।
এই যে পরিযায়ী শ্রমিকগুলো মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে চলেছে বাড়ি ফেরার তাগিদে
সেই শ্রমিকদের পদতলের ক্ষতের রক্তের গন্ধ আমি পাচ্ছি।
সেদিন দেখি একজন ক্ষুর্ধাত মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকা একটা মৃত কুকুর খাচ্ছে,
আমি সেইসব ক্ষুর্ধাত মানুষগুলোর ক্ষুধার গন্ধ পাচ্ছি।
আমাজনের জঙ্গলে আগুনে পোড়া গাছ ও বন্য প্রাণী ভস্মীভূত হওয়ার গন্ধ পাচ্ছি।
বিধ্বংসী ঝড়ে আশ্রয়হীন মানুষগুলোর কান্নার গন্ধও পাচ্ছি।
কেরালার জলে মৃত্যু বরণ করা হাতির পেটের মধ্যে যে ফাটা বাজির গন্ধটাও আমি তীব্র ভাবে পাচ্ছি।
আর সবশেষে পাচ্ছি প্রকৃতির প্রতিশোধের।
আমাদের মনে তাই পেয়েছো তুমি চিরস্থল।।

শ্রীলেখা দাস
নৃবিজ্ঞান - ২০১৫

প্রকৃত শিক্ষা

আজও মনে পড়ে মা'র সেই কথাটা
" বড় তোকে হতেই হবে থাক দুঃখ ব্যাথা।
যে শিক্ষা পাইনি আমি শৈশব থেকে
সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে তোকে।"

বারে বারে সেই কথা রেখে আমি মাথায়
সব যন্ত্রনা সহ্য করি লুটোই না ব্যাথায়।

পড়াশুনা করবো আমি আসুক যত বিপদ
মানুষের মত মানুষ হব - এই আমার শপথ।

দিন যত যায়, সংকট যত বাড়ে
চারিপাশের অবহেলা, একাকী আমায় করে।

পাই না আমি ভয়, আছে আমার উদ্যম
মা'র আশীবার্দ সঙ্গে আছে, সাহস কি আমার কম ?

কিন্তু সমাজব্যবস্থার হেন অপমান
মাঝে মাঝে স্বপ্নগুলোকে করে দেয় খান খান।

ভাবি আমি গরীব হওয়া নয় তো কোনো দোষের
তবু কিছু নিন্দুকের কথা - এদের আবার শিক্ষা কিসের ?

বেঁচে থাকতে এত দুঃখ, এত লাঞ্ছনা, এত বিদ্বেষ
আপন মাতার সন্তান আমরা - এটাই কি তার রেশ ?

তাই, নাই বা পেলাম সম্মান, নাই বা উপকার
মানুষ হয়ে মানুষেরই পাশে দাঁড়াবো বারংবার।

মা'র স্বপ্ন পূরণ করবো পেয়ে প্রকৃত শিক্ষা
মা'র সঙ্গে জানি তাই
আমার শিক্ষক শিক্ষিকা পাশে থাকবেন।

—— পিয়ালী দাস
B.A., 2012

চেনাপথ

না ! কোনো হিসেবের মিল খুঁজে পাই না।
পরপর সাজানো জীবনের হিসেবগুলো
'সিড়ি ভাঙা অঙ্কের' মতো মিলতে চাইলেও
শেষ লাইনে এসে ভুল থেকেই যায়।

চেনা মুখ, মুখোশের আড়ালে ঢেকে যায়।
চারশো - ছয়শো স্কেয়ার ফিট্ ফ্ল্যাটের
সংক্ষিপ্ত জায়গায় থাকা মানুষগুলোর
মধ্যেও আজ মনের দুরত্ব অনেক অনেক বেশি।
বিবেক, বোধ আর বুদ্ধির মধ্যে সংঘাত চলে।
কেউ বোঝে না, না কি না বোঝার ভান
করে চলে, তা বুঝে উঠতে পারি না।

হতোদ্যম মনের আয়নায় কিছু ছায়া ভেসে ওঠে।

মনে হয়, সব কবিতা ভাসিয়ে দিই
ব্রহ্মপুত্রের জলে, বলে উঠি -
'থাক অনেক হয়েছে !'
এর থেকে 'স্মৃতির টুকরো ছবি' আঁকড়ে
বেঁচে থাকি আলো - আঁধারি পথে।

—— নীলাঞ্জনা রায়
English (Hons), 1999

মিছিল

পতাকা ত্রিবর্ণ, গৈরিক অথবা লাল,
ঢেকে দেয় দিকচক্রবাল।
প্রতিবাদে প্রতিরোধে পদপিষ্ট ধরণী
বস্তুত যা স্বর্ণরত্নরাজি, খাদ্যের খনি।
সর্বৎসহা মরুময়, অথবা শ্যামল
ঘাসের সুকোমল
পাহাড়ের বুকে নিয়ে নির্বাক পৃথিবী
নানান শ্রেণীবদ্ধ বর্ণময় ছবি।
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত সারে সারে চলে
দলে দলে
নানান মিছিলে মিছিলে।
কখনো রাজনীতি বা রণনীতি
স্বার্থে কলুষতায় সম্মতি বা অসম্মতি।

আরও আছে, অন্য কেতনের উচ্ছাসে
ধর্মান্ধ ভক্ত চলে অমোঘ বিশ্বাসে
স্থাপিত হবে এক ধর্মরাজ্য।
বিদিশা থেকে কান্যকুব্জ
বিস্তৃত পরিধিতে ধর্মের অলোড়ন
কঠোর থেকে কঠোরতর কৃচ্ছসাধন
এও আর এক আন্দোলন।

তথাগতও একদিন দুঃখের হোমানলে
চলেছিলেন অনন্য মিছিলে
সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমণের সাথে
পায়ে হেঁটে নানা পথে পথে
অনন্ত শান্তির সন্ধানে
যে মন্ত্র আজও ধ্বনিত তিব্বতে, চীনে জাপানে।

রনক্লান্ত মিছিলে হাঁটে সব দেশে
জর্জরিত হিংসার বিভেদে বা বর্ণবিদ্বেষে
আরও দূরে।
সকরুন সুরে
উদ্বাস্তুর মিছিলে দল হাঁটে সন্ত্রাসে
এক দেশ হতে অন্য দেশে।
শরণাগত মানুষ কখনো বা ভারতের পানে
মেক্সিকো অথবা লেবাননে
চলে শুধু নিরাপদ আশ্রয়ের টানে।
তুঘলরকী রাজশাসনে,
পরিযায়ী শ্রমিকদলও ফেরে নিজ গৃহ পানে।

আনন্দেও ছুটে চলে শ্রেণীবদ্ধ মানুষের দল
পেরিয়ে দীর্ঘ পথ, অথবা জঙ্গল।
পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পর্বতারোহীর দল
প্রত্যয়ে স্থির অবিচল।

রাত্রির আকাশে তারাদের এলোমেলো মিছিল
যখন কালো হয়ে যায় দিগন্তের নীল।
কাজ থেকে ঘরে ফেরে দলবদ্ধ মানুষজন
গন্তব্য শিয়ালদহ কিম্বা হাওড়া ষ্টেশন
সেও তো মিছিল এক ব্রিজের ওপরে
পিঁপড়েরা যেমন যায় সারে সারে।

যুগে যুগে শোনা যায় মিছিলের গান।
পথ রুখে দিতে চায় সাম্রাজ্য লেলিহান।
ভেঙ্গে পড়ে রাজস্তম্ভ, দর্পিত প্রশাসন
মিছিল তো চলবেই, যতদিন থাকবে আন্দোলন।

— শুভেন্দু দত্ত
(বাংলা, ১৯৭১)

ঝড়

এমন একটা ঝড় উঠুক
সবকিছু ওলটপালট করে দিয়ে
ফিরিয়ে দিক একটা নতুন সময়
নতুন সমাজ
সঙ্গে আনুক সবুজের সমারোহ,
মানুষের মনুষ্যত্ব ও কর্তব্য বোধ।

এমন একটা ঝড় উঠুক
যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে
পৃথিবীর সকল কান্না- হাহাকার।

এমন একটা ঝড় উঠুক
প্রেম . ভ্রাতৃত্ববোধ . আবেগ.
মায়া-মমতা এক জায়গায়
কুন্ডলী পাকিয়ে
ঢুকে যাক মানুষের হৃদয়ে।

বৃদ্ধাশ্রম, পাগলাগারদ নিশ্চিহ্ন হোক।
নিশ্চিহ্ন হোক ধর্মের হানাহানি।
আবার নতুন সূর্য উঠুক,
প্রকৃতি সাজুক বাহারি সাজে।

কামনা - লোভ ভুলে,
প্রকৃত প্রেমের আসুক জোয়ার।
এমন একটা ঝড় উঠুক
কেড়ে নিয়ে যাক্
মানুষগুলোর মুখের অকথ্য ভাষা
আর বাসনার নেশা
মা - বোনকে আর যেন কোথাও
না হতে হয় লাঞ্ছিত-ধর্ষিতা।

একমুঠো চালের জন্য
আর মানুষ না কাঁদে,
দোরে দোরে ঘুরে,
মাথাখুঁড়ে খিদের জ্বালায়
একবছরের সন্তানের সাথে,
বাবা-মাকে আর যেন -
আত্মহত্যা না হয় করতে ?????

এমন একটা ঝড় উঠুক -
বোমা - গুলি - বারুদ,
তলিয়ে নিয়ে যাক্ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস !
পৃথিবীকে শীতল করে,
মুছে দিয়ে যাক
তার সকল অন্ধকার,
তার কলঙ্কিত সকল ইতিহাস।

— সুবীর সিনহা
উদ্ভিদ বিদ্যা, ১৯৯২

বিড়াল

(একটা অ-রাজনৈতিক আখ্যান)

ভরদুপুরে কমলাকান্ত চৌকির ওপর বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছিল। গতকাল নসীরামবাবু বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডায় একখান্ 'তুশ্চু' ব্যাপার নিয়ে প্রবল তক্কো হওয়ায় মেজাজটাও কেমন যেন খিচঁড়ে আছে। আফিমের নেশাটাও এখন আর তেমন জমেনা। ব্যবসায়ীগুলো আফিমেও ভেজাল দিচ্ছে নাকি ? কে জানে ! সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে। কে কত বেশি ঠকাতে পারে, চারদিকে যেন তারই প্রতিযোগিতা চলেছে। প্রসন্ন দুধে জলের ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আজকাল দুধে জ্বাল দিতে গিয়ে ছাঁকনিতে গুঁড়ি-পানাও পাওয়া যাচ্ছে। দুধে পুকুরের জল দিচ্ছে নাকি? হবে হয়তো ! প্রসন্নকে তো জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। তাই কমলাকান্ত বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছে। এসব নানা বিষয় মাথার মধ্যে আনাগোনা করাতে ঝিমুনি ও চিন্তাসূত্র ছিন্ন হচ্ছিল বারংবার। এমন সময় চৌকির তলা থেকে একটা অতি-পরিচিত, মৃদু ও সুমিষ্ট স্বর শোনা গেল-'ম্যাও' (পাঠক পড়বেন - 'মাও')। কমলাকান্ত চোখ-না-খুলে বলল- 'কে ও ? মার্জ্জার সুন্দরী নাকি ? এমন অসময়ে হঠাৎ কি মনে করে ?', মনে মনে ভাবল- আবার এসেছে জ্বালাতে।'; 'তা কানের গোড়ায় 'মাও-মাও' কর কেন ? কমলাকান্ত ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল। বিড়াল বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, 'বিড়াল 'মাও-মাও' করবে না তো কি 'কামাও-কামাও' করবে তাছাড়া এই বিশেষ গুনটা কেবলমাত্র মনুষ্যসমাজেরই একচেটিয়া বলে শুনেছি। মনুষ্য ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর কামাও - বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা কখনো শুনিনি। কমলাকান্ত বুঝতে পারল, বিড়াল কিছু বলতে এসেছে। বিড়াল বলল, দেখ, আমার শরীরটা আজ বিশেষ ভালো নেই। ক'দিন ধরে অরুচি আর ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছি। কমলাকান্ত হেসে বলল - 'কেন? লোকের পাতে বুঝি এঁটো-কাঁটা আজকাল উপ্‌চে পড়ছে? তা দিনকয়েক ওসব ভূরিভোজ না করে একটু দুধ-সর খেয়ে তো দেখতে পার। বলতো আমি প্রসন্নর দেওয়া দুধ থেকে তোমার জন্য কিছুটা সরিয়ে রাখতে পারি'। শুনে বিড়াল বিমর্ষ হেসে বলল, - 'তোমার যেমন বুদ্ধি! বিড়ালের আবার মাছে অরুচি! আর তোমার প্রসন্ন'র 'দুধ-মেশানো জলে' আমার বিশেষ ভক্তি নেই। লোকে ডাল-ভাত জোটাবে কি করে সেকথা ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ভাবছ মাছের মাথা, দুধ-সরের কথা।' কমলাকান্ত বিচলিত হয়ে বলল, 'একথা বলছ কেন? যার যেমন রোজগার তাতেই সংসার চলবে। তাছাড়া এসব ভেবে তোমার কি লাভ?' বিড়াল নীরস বদনে বলল,- ' আমার লাভ বিশেষ নেই, তবে লোকসানের কথা ভেবে চিন্তায় আছি।' কমলাকান্তের নেশা ততক্ষনে কাটতে শুরু করেছে। বিড়াল বলল- ' দেখ, কৃষক যদি ফসলের সঠিক মূল্য না পায়, তাহলে তার চলবে কি করে? পরবর্তী চাষের খরচ, পরিবারের সম্বৎসরের খোরাকি-খরচ আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া ভবিষৎতের জন্য কিছু সঞ্চয়ও তো করা চাই, তাই নয় কি?' কমলাকান্ত হেসে বলল, 'তাহলে সঞ্চয়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ, তাও ভালো'। বিড়াল কমলাকান্তের ব্যঙ্গোক্তি গায়ে না মেখে বলল, 'সঞ্চয় বলতে আমি ধনীর ধনবৃদ্ধির কথা বলছি না, বলছি দরিদ্রের মুষ্ঠিসঞ্চয়ের কথা। আগে আমি যে চোরের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছিলাম, সেটাও সেই চোর, যে কৃপণ ধনীর ঘরে চুরি করে, দরিদ্রের ঘরে নয়। এখন আমি কৃষকের পক্ষ নিয়ে কথা বলছি। তুমি সারাদিন আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাক, তুমি কি করে বুঝবে? আমি সর্বদা ন্যায়ের পক্ষেই কথা বলে থাকি। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, 'পরোপকারই পরম ধর্ম'। যদি পরের উপকার করতে না পার, তাহলে তোমার ধর্মপথে চলবার আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'

কমলাকান্ত চিন্তায় পড়ে গেল। বিড়াল কমলাকান্তের মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'ভাব দেখি! সরকার যদি কৃষকের সহায় না হয়, তাহলে কে হবে ? প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বিভিন্ন অসুবিধায় সরকার যদি কৃষকের পাশে না দাঁড়ায়, তবে কে দাঁড়াবে ? কৃষকের উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়ের ওপর যদি সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে দরিদ্র, অসহায় কৃষকরা কার কাছে সুবিচার প্রত্যাশা করবে ?' কমলাকান্ত জানত, এ মার্জ্জারকে তর্কে পরাস্ত করা কঠিন। তবু সে বলল, ' কেন ? কৃষক শুধুমাত্র সরকারি নির্দেশমতো চলবে কেন ? নিজের ইচ্ছামতো চলবে না কেন ?' 'নিজের ইচ্ছামতো মানে ? - বিড়ালের চোখে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা। কমলাকান্ত আমতা-আমতা করল - 'মানে কৃষক যা-ইচ্ছা দামে, যাকে ইচ্ছা তাকে ফসল বিক্রি করবে। আরে বাবা, এতে করে তো তারা অনেক বেশি লাভ করতে পারবে।' বিড়াল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলল, 'যাকে ইচ্ছা তাকে মানে ঐসব বড় বড় ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি এদের কথা বলছ তো ? শোনো হে কমলাকান্ত! কৃষক অন্নদাতা, বেনিয়া নয়। কৃষকের উৎপাদিত পণ্যে ব্যবসায়ী, পুঁজিপতিদের অধিকার থাকবে ? আর তারা যদি সুযোগ পেয়ে মাথায় চড়ে বসে, তখন ? যদি বাজারের দাম তারাই ঠিক করতে শুরু করে, তখন ? কৃষকরা ঐ পুঁজিপতিদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে, একথা তুমি বলতে পারলে ? কমলাকান্ত বুঝতে পারল, এর সঙ্গে বিতর্ক অনুচিত। সে প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টা করল। বিড়াল তাতে কর্ণপাতও না করে অবজ্ঞার সুরে বলল - 'তুমি যে এই আফিমের নেশা কর, এটা যদি তুমি পাড়ার মুদির দোকানে এক আনা দামে না পাও,

যদি বড় বড় মার্কেট থেকে ঝক্‌মকে প্যাকেটে চারগুন বেশি দাম দিয়ে তোমায় কিনতে হয়, তখন কি করবে ? কমলাকান্তের চক্ষু বিস্ফারিত হল। বিড়াল সেদিকে তাকিয়ে বলল – 'সাধারন মানুষের কাছে আলু-পেঁয়াজও যা, তোমার কাছে আফিমও তাই। সারাটা জীবন তো ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে আয়েশ করে কাটিয়ে দিলে। দরিদ্রের যন্ত্রণা তুমি আর কি বুঝবে ? বাজারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ জীবনধারণ করবে কি করে বলতে পার? দেখ! আমি তোমার মতো শয্যাশায়ী নই, অবিবেচকও নই। আমি মানুষের ক্ষুধার অন্নে ভাগ বসাই না, তাদের উদ্বৃত্ত অন্নে প্রতিপালিত। হ্যাঁ, কখনো-সখনো পেটের জ্বালায় চুরি করে খাই বটে, কিন্তু তার জন্যে তো তোমার মতো অকর্ম্মন্য, অলস ব্যক্তির ঠেঙাও খেয়ে থাকি। মানুষ যদি খেতেই না পায়, তার উদ্বৃও অন্নই বা আসবে কোথা থেকে ? আর যদি তা না-ই আসে, আমারও খেতে পাওয়ার আশা দুরাশা। আমি ধনীর ঘরে চুরি করি দৈবাৎ; দরিদ্র, অভুক্তের ঘরে নয়। পন্ডিত মনুষ্যের চেয়ে আমার বোধ- বুদ্ধি কোনো অংশে কম নয়। তাই সবদিক বিবেচনা করে দেখলাম, বিপ্লবই একমাত্র পথ। আর তো কোনো রাস্তাই খোলা দেখছি না। কমলাকান্ত অট্টহাস্য করে বলল,- 'বিপ্লব! বিপ্লব তো একটা ইলিউশন মাত্র। তাছাড়া কখনো দেখেছ কি, বিপ্লবের পরবর্তী সমাজব্যবস্থা কোনো কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পেরেছ ? দি গ্রেট ফরাসী বিপ্লবের কথাই ধর না.....' বিড়াল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল- 'তুমি যথার্থই কাপুরুষ, মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার বটে। একই রকম রয়ে গেলে। এতটুকু বদলালে না। ধনী পুঁজিপতিদের জন্যে দরিদ্র কৃষকেরা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করুক-তুমি কি এটাই চাইছ? সমাজে চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তোমার মতো আফিমখোরের কি লাভ? ধনী ব্যবসায়ীরা দরিদ্র কৃষকদের ক্ষুধার সামগ্রী অনৈতিকভাবে সঞ্চয় করে চোরাবাজারে ধনবৃদ্ধি করবে, তাতে সমাজের কোন্ উন্নয়ণ হবেটা শুনি? তোমার মতো অজ্ঞ মনুষ্যের উচিত আমার মতো বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ করা।

'বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে।'
('বিড়াল' প্রবন্ধ / কমলাকান্তের দপ্তর / শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কমলাকান্ত সেই প্রথামতো বিড়ালকে বলল-

'এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও।' (ঐ)

আরো বলল, 'তুমি যদি বল, তবে পড়বার জন্যে তোমাকে আমি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি' বইখানা দিতে পারি। 'বিড়াল বলল, 'থাক্। ধর্মাচরণের কথা তোমার মতো অধার্মিকের মুখে শোনার ইচ্ছা আমার নেই। নাস্তিকেরও কিছু নীতিজ্ঞান থাকে, অধার্মিকের নয়।' এই বলে সে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল।

কমলাকান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, 'যাক্ বাবা! বাঁচা গেছে', এবং একটি অশান্ত জীবাত্মাকে কোনোমতে শান্ত করতে পারা গেছে ভেবে মনে মনে বিশেষ আত্মতুষ্টিও লাভ করল।

[সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিড়াল' প্রবন্ধ অনুসরণে লিখিত।]

—— ডঃ রুপালী ধাড়া, ১৯৯৩
বাংলা বিভাগ, বর্তমানে
Associate Prof. N. D. College

এক পাহাড় চুরির গল্প

লেদাবোনা নামটা কখনও শুনেছেন ? শোনেননি । আচ্ছা, তাহলে তিলাবনী ? এটা কেমন চেনা চেনা ঠেকছে না ? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, পুরুলিয়া জেলার একটা মৌজা ! তিলাবনী আর কলাবনী দুই মৌজা নিয়ে এই পাথুরে অসমতল ভূমিতে সাঁওতাল, মাহাতো বিভিন্ন প্রাচীন জনজাতির বসবাস । তিলাবনী পাহাড় এই মানুষ গুলোর জীবনের সুখ-দুঃখ, হাঁসি কান্নার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । তিলাবনী মৌজা মোটামুটি ৩৩.৯১ একর জমি (গ্রামের মানুষের কথা অনুযায়ী) নিয়ে গঠিত । তিলাবনী পাহাড়কে ঘিরে রেখেছ আদিবাসী গ্রামগুলো । পূর্বে লেদাবোনা, পশ্চিম দিকে মাধবপুর, উত্তরে পরাশিবোনা, দক্ষিণে তিলাবনী । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঠিক লিখে বোঝাতে পারব না হয়ত । স্থানীয় মানুষদের কথায় 'তাল' থেকে তিলাবনী নাম টা এসেছে । আঁকাবাঁকা লালমাটি, কাঁকর, পাথর বিছানো পথে যেতে যেতে তাল, খেজুর, পলাশ, মহুয়া, আপনাকে স্বাগত জানাবে । ছোটবড় জলাশয়, ছবির মতো আদিবাসীদের গ্রাম, ছোটো ছোটো শিশুদের জলকেলি, কলরব, সবই কেমন শহুরে বিবর্ন চোখে নতুন লাগবে । আমার কাছেও তাই লেগেছিল । যেদিকে দুচোখ যায় ফাঁকা প্রান্তর আর দূরে বেশ কয়েকটা পাহাড় । আরে মালভূমি অঞ্চলে আস্ত পাহাড় ? মনে হচ্ছিল গাড়িটা খুব আস্তে চলছে, উফ্ আর কত যাবো রে বাবা, নামতে পারলে বাঁচি । আসলে আমাদের গন্তব্য ছিল ঠিক ওই পাহাড়েরই কোলে । জানতাম না । ভয়ঙ্কর ভাবে হেলেদুলে আরো বেশ খানিকটা সময় নিয়ে আমরা পৌঁছলাম সেখানে । আমাদের **RCC** (রক ক্লাইম্বিং কোর্স) **Camp** এ ।

প্রকৃতির শীতের চাদর সরিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ তিলাবনী সুন্দরী র । গরম চা খেতে খেতে আলাপ জুড়লাম । একজনের সাথে বেশ ভাব হলো আমাদের দুজনের । দিনচারেক থাকবো কিনা তাই একটু চোখাচোখি, মুচকি হাসি, সবই নীরবে চলতে লাগলো । কখনও আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিই তো কখনও সে আমাকে । যাইহোক প্রেম জমে উঠলো । মনে হলো আদ্যিকালের চেনা । আমাদের রান্নাবান্নার কাজে অশোক হেমব্রম সাহায্য করছিলো । ওর থেকে তো কত গল্পই শুনলাম । বেশ প্রাণবন্ত ছেলে । তারপর একদিন সন্ধ্যায় ক্যাম্পের আড্ডায় শুনলাম সেই ভয়ঙ্কর গল্পটা । ভূতের নয় মোটেই । গোটা তিলাবনী সুন্দরী কে লুটে নেওয়ার চেষ্টা । হ্যাঁ, ঠিক বলছি ।

পাহাড় কেটে পাথর উত্তোলন করে গাড়ী করে কলকাতায় চালান কর হয় বিভিন্ন নামী দামী মার্বেল ফ্যাক্টরি তে ! গ্রানাইট সাপ্লাই দেয় বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থা কে । আর এই কাজের জন্য গোটা পাহাড় টাকে লীজ দেওয়া হয় ১০ থেকে ১২ বছরের জন্য । সরকারের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের থেকে । তবে আইন শৃঙ্খলা র নামমাত্র বজায় না রেখে যথেচ্ছ ভাবে পাথর কাটে এই সব কোম্পানি । তাই কিছুদিনের মধ্যেই গোটা পাহাড় টা ছোট হতে শুরু করে । একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । শুধুই পড়ে থাকে এবড়োখেবড়ো পাথুরে কঙ্কাল ।

এমনই একবার এই সুন্দরী কে লুটেরারা লুট করতে আসে । বাদসাধে গ্রামবাসী রা । তারা সবাই মিলে পাহাড়ে উঠে, কেউবা পাহাড়ের নীচে শুয়ে, অনশন শুরু করে । তাদের কাছে 'বুরু' (সাঁওতালি ভাষায় পাহাড়কে বলে) হলো পরম আত্মীয়, আপনার জন । ওরা প্রকৃতি মাতার সন্তান । তাই প্রকৃতি ওদের 'গো' (মা) । আর দা (জল) হলো ওদের বাবা । 'বাহা' (ফুল) হলো স্বজন । তাই প্রকৃতির সম্পদ সর্বশক্তি দিয়ে ওরা রক্ষা করবে । পিছু হঠতে বাধ্য হয় সেই দুর্বিনীত অপরাধীর দল । বেঁচে যায় তিলাবনী বুরু । বেঁচে যায় প্রকৃতি । পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেলো বার্তা । প্রকৃতিকে বাঁচানোর অঙ্গীকার । সেদিন সেই আড্ডায় বসে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয়েছিলো । ঘটনা র বিবরণ দিতে গিয়ে সেই ছেলেটি যে কতটা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল চোখের সামনে দেখছিলাম । আর দেখেছিলাম আমাদের ক্যাম্পের ট্রেনি থেকে ইন্সট্রাক্টর সকলের ই চোয়াল শক্ত হওয়া, বুছেছিলাম আমাদের এই অস্থায়ী সংসারের প্রত্যেক সদস্যরা কতটা প্রকৃতিপ্রেমী । তাইতো আমরা পাহাড়ের জন্য কাঁদতে পারি । নদীর পাড়ে গাছ লাগিয়ে সুখ পাই । সমুদ্রের পাড়ে জমে থাকা জঞ্জাল সাফ করতে কোমর বাঁধি । জঙ্গল কাটতে এলেই ঝগড়া করি । পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে মাইলের পর মাইল সাইকেল চালিয়েও ক্লান্ত বোধ করিনা । আসুন না, আমাদের মতো পাগলদের সাহায্য করতে । শহুরে বদনাম ঘোচাতে । সবাই ভালো থাকবেন ।

— মহুয়া দত্ত
বাংলা, ১৯৯৪

‘মানুষ মানুষের জন্য’

‘করোনা’ নামক মারণ ভাইরাস গত একবছরে আমাদের সবাই কে কমবেশি নতুন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ লকডাউন জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। কত মানুষ কাজ হারিয়ে নতুন করে জীবন যুদ্ধের রসদ খুঁজছে, কেউ বা তার বেকারত্বের যন্ত্রণা আরও দীর্ঘতর হওয়াই আড়ালে চোখের জল ফেলছে। সত্যি বলতে ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এধরণের পরিস্থিতির জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আমাদের বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বিধ্বংসী ‘আমফান’, যার তান্ডবলীলাতে হাজার-হাজারা গরীব অসহায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে কিছু মানুষের এগিয়ে আসা ভীষণ প্রয়োজন ছিলো। আমি বিশ্বাস করি আমার সোনার বাংলা তে এখনও ভালো মানুষের সংখ্যাটা বেশি। কত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিজেদের সাধ্যমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কত কত মানুষ তাদের সাহায্যের হাত টুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদেরই কোনো সহ নাগরিক কে একটু টেনে তুলতে।

আজ আমি বলবো ‘স্বপ্ন দেখার উজান গাঙ’ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের গল্প, না না এটা কোনো গল্প কাহিনি নয়, এটা বাস্তব কাহিনি। মূলত শিক্ষাতে স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে যাদের পথ চলা শুরু হয় গ্রামীণ হাওড়ার আমতা এলাকাতে দুই উদ্যমী যুবক, পৃথ্বীশরাজ কুন্তী ও তাপস পালের হাত ধরে। পথ চলা শুরুর দিনে এর সদস্যা সংখ্যা ছিলো হাতে-গোনা গুটিকয়েক, যারা শপথ নেয় গ্রামীণ হাওড়া এলাকায় যদি এমন কোনো মেধাবী ছাত্র ছাত্রী থাকে যার উচ্চ শিক্ষার পথে মূল বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য, তখনই এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ব্যাপ্তি, সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে।

২০১৮ সালে পথ চলা শুরু করা একটি সংগঠন বিগত দু-একবছরের মধ্য স্থানীয় এলাকাতে সম্ভাষণ আদায় করে নেয় নিজেদের নিষ্ঠা আর কাজের মাধ্যমে। এই ‘উজান গাঙ’ পরিবারের মধ্যে একসাথে হাত ধরে মিশে আছে শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক পদে থাকা কর্মী থেকে ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক কর্মি থেকে শুরু করে ডাকবিভাগের কর্মচারি এমনকি একাধিক ছাত্র ছাত্রীও। যারা তাদের সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতা দ্বারা ও বিভিন্ন সময়ে বহু শুভাকাঙ্খীদের আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতায় একের পর এক মেধাবী দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের সারা বছরের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে, শুধু দায়িত্ব নেওয়া নয় তাকে সঠিক দিশা দেখিয়ে বছরব্যাপী পাশে থেকেছে।

শুধু এবিষয়ে নয়, এই সংস্থা পরিবেশ রক্ষা, বন্যপ্রাণী দের সুরক্ষা নিয়ে প্রচার, শীতার্ত দিনমজুরদের শীতবস্ত্র দানের কর্মসূচি চালিয়ে গেছে বছরব্যাপী। সমাজের ছবি পাল্টাতে গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে স্যানিটারি প্যাড বিলি করেছে সংস্থার মহিলারা। যার গুরুত্ব মহিলাদের বুঝিয়েছেন বাড়িতে গিয়ে। সচেতনতায় তাদের এ ধরনের কর্মসূচি সাড়া ফেলে সমগ্র ব্লক লেভেলে। স্থানীয় বিডিও পর্যন্ত অভিনন্দন জানিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন এদের।

লকডাউন-এর কারণে যখন বহু মানুষ কাজ হারিয়ে গৃহবন্দী তখনও এরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে কাজ করে গেছে, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। গ্রামীণ হাওড়ার প্রায় ১৫০০ টি পরিবারের হাতে মার্চ মাস থেকে নিয়মিত ভাবে মুদিখানার সামগ্রী তুলে দিয়েছে। সংগঠনের ছেলেরা মাইক হাতে সকাল থেকে স্থানীয় বাজার গুলিতে প্রচার করেছে স্যোশাল ডিসটেন্স এর গুরুত্ব। মানুষকে সতর্ক করে গেছে বছরব্যাপী, এর সাথে সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয়-এর ল্যাব-এর সহযোগিতায় তৈরি করেছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার যারা বিনামূল্যে গরীব অসহায় দের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া শুধু নয় এর ব্যাবহার কৌশল ও শিখিয়ে এসেছে।

শুধু মাত্র স্যোশাল মিডিয়াতে প্রচার করে, সকলের আর্থিক সাহায্য নিয়ে, তারা ছুটে গেছে আমফান-বিদ্ধস্ত সুন্দরবনের একেবারে প্রান্তিক একটি দ্বীপ অঞ্চলে, সেখানকার মানুষদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। এত কিছুর মাঝে মূল লক্ষ্য থেকে সরে যায় নি তারা। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সারা রাজ্য-ব্যাপী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী গরীব মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের ডেকে সম্মানিত করেছে তারা, তাদের লড়াই এর কাহিনি তুলে ধরেছে মানুষের মধ্যে, একাধিক শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

সংস্থার সদস্যরা কখনো তাদের জন্মদিনে তাদের আনন্দ ভাগ করে নিয়েছে গরীব প্রতিবন্ধী ছাত্রকে হুইল চেয়ার তুলে দিয়ে কখনো

মেয়ের জন্মদিনে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছে ইটভাটা এলাকার অসহায়দের বাড়িতে গিয়ে। এভাবেই নিজেদের আনন্দটুকু তারা ভাগ করে নিয়েছে অসহায়দের সাথে, কারণ এই পথ চলাতেই তাদের আনন্দ, এ এক অন্য স্বাদ।

আমি এই সংগঠনের অতীব ক্ষুদ্র এক সদস্য, মানসিক ভাবে সাথে আছি প্রায় শুরুর দিন থেকে। কাজগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম কেবল, কারণ এই সংগঠন একটি অরাজনৈতিক ধর্ম নিরপেক্ষ সংগঠন সকলে মিলে এক ঐক্যবদ্ধ পরিবার। ক্ষয়িষ্ণু এ সমাজে অন্যের কথা আমরা ভাবতে ভুলে যাচ্ছি, কেবল আমি-সর্বস্ব জীবন বেছে নিচ্ছি আমরা। মানবিকতা, বিবেক সব কিছু যেন বন্ধক দিয়ে দিয়েছি। আসুন না, সকলে মিলে আমাদের পাশাপাশি মানুষ গুলোর পাশে দাঁড়াই। সব সময় কোনো সংগঠনের সাথে থাকতে হবে তা কিন্তু না, ক্ষুদ্র সামর্থ্যেও ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কত মানুষের পাশে থাকা যায়, ইচ্ছাশক্তিটুকু দরকার কেবলমাত্র। বিবেকহীন এই সমাজে কত কত প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে শুধু একটু হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অভাবে, একটু মানবিকতার হাতটা বাড়ান সকলে, দেখবেন এই আনন্দের মতো আনন্দ অন্য কিছুতেই নেই। আমি বিশ্বাস করি আমার সোনার বাংলা আরও অনেক সুন্দর হতে পারে। দায়িত্ব তো আমাদেরও, আজ না হলে আর কবে ভাববেন। তাই অনুরোধ সকলের কাছে, সামর্থ্য মতো, এলাকার অসহায় গরীব দের পাশে একটু থাকুন, আশেপাশের পথশিশু দের একটু ভালোবাসা দিন। কারণ....

" সবার উপরে মানুষ সত্য " ....

সৌভিক চৌধুরী
রসায়ন - ২০১৫

আকাশময় বৃষ্টি

আসছি..... দাঁড়াও।

উফ্ কী দেরি হয়ে গেল।

বৃষ্টির প্রতিদিনের অভ্যাসই এটা। রোজই তারই তার কিছুনা কিছু কারনে দেবি হয়ে যায়। আর তার মা তাকে তাড়া দিয়ে দিয়ে অস্থির।

মাকে দাঁড়াতে বলেও ঘর থেকে বেরোতে বৃষ্টির দশ মিনিট লাগল।

-কি করিস বলত ? সাজের যা বহর সেই ঝোড়োকাকের মতোই লাগছে।

-উফ্ মা, তুমি যে কী বলোনা। একে দেরি হয়ে গেছে.....

ঠোট ফুলিয়ে অভিমানের সঙ্গে কথাগুলো বলে সে।

- সাবধানে যাস, দুগ্গা দুগ্গা।

-আসছি

সাড়ে দশটার পরিবর্তে এগারোটা বেজে যায় অফিস ঢুকতে। ঢুকেই বৃষ্টিকে বস্ এর কাছে জবাবদিহি করতে হল, এ তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সমস্ত ঝামেলার পর নিজের কেবিনে ঢুকে বসে পড়ে ফাইল খুলে। কাজ করতে করতে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আজ তো আকাশনীল এর জন্মদিন। শুভেচ্ছা জানাতে তো সে ভুলেই গেছে।

ব্যাগ খুলে মোবাইল বার করে নিজের হাতে লেখা চিঠিখানার একটা ছবি তুলে নেয়। চিঠিতে আকাশকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ছবি তুলে হোয়াটস্অ্যাপে পাঠিয়ে দেয়। তবে এখনও মন অশান্ত, ভাবছে কী করে সে এতো বড়ো একটা দিনের কথা ভুলে গেল।

আকাশনীল তার সেই বন্ধু, যাকে সে কখনই বাইরের লোক হিসাবে ভাবেনি। আকাশ বৃষ্টির সাথে থাকে না ঠিকই কিন্তু বৃষ্টি আকাশ ছাড়া চলে না। সে যখন কলেজে পড়ে তখন আকাশের সাথে প্রথম দেখা হয় আর প্রথম দেখাতেই সে আকর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার হৃদয়ে আকাশের জায়গাটা বদলে যায়, ভালোলাগা ভালোবাসায় পরিনত হয়। কিন্তু এই কথা বৃষ্টি কোনোদিনই জানায়নি। আজ তার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃষ্টির এতদিনের জমিয়ে রাখা অমলিন ভালোবাসার কথা জানাবে, কিন্তু তা আর হলো কৈ।

আষাঢ় মাস, বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে দেখে বৃষ্টির মনে এল সে আজকে অফিসে ছাতা আনতে ভুলে গেছে। অফিস থেকে বেরোবার আগে ফোনটা একবার চেক করে নিল।

-নাহ্, কোনো মেসেজ নেই, কিন্তু ছবিটা দেখেছে। মনে মনে ভাবল আকাশ হয়তো রেগে গেছে।

রাস্তায় নেমে অটো রিক্সা না পাওয়ায় বাস ধরার জন্য হাঁটা শুরু করতে হল। কিছুদুর গিয়ে একটা রেস্তোরায় ঢুকে পড়ল। এই আবহাওয়ায় একটু কফি না খেলে চলছেনা। চুল ও জামা খানিকটা ভিজে গেছে, সেগুলো ঝেড়ে নিয়ে এক কাপ কফির অর্ডার দিল। হালকা শীতে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বাইরের প্রকৃতির মোহময় দৃশ্য ও আকাশের ভাবনায় বৃষ্টির মন আচ্ছন্ন হয়ে এল।

ব্যাগের মধ্যে রাখা মোবাইল ফোনটা ঝন্ঝন্ করে বেজে ওঠায় চমক ভাঙল। আকাশই ফোন করেছে।

- হ্যাঁ বল

- তুই কোথায় ?

- আমি একটা Restaurant-এ

- তোর অফিসের পাশের টায় তো ?

- হ্যাঁ

- তুই বস, আমি আসছি।

- এখনই ?

- হ্যাঁ।

ফোনটা কেটে গেল। কি ব্যাপার আজ হঠাৎ আকাশ নিজে আসছে। বৃষ্টির ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন উথাল পাথাল করতে থাকে। আজ পর্যন্ত যতবারই আকাশ ও বৃষ্টি ঘুরতে বেরিয়েছে, সেই আকাশকে আনতে গেছে।

আধঘন্টা পর প্রায় আধভিজে অবস্থায় আকাশ রেস্তোরায় ঢুকল, সঙ্গে একটি মেয়ে, ফর্সা, লম্বা সুশ্রী চেহারা, আকাশ ও বৃষ্টির তুলনায় বয়সে ছোটো। মেয়েটিকে দেখে বৃষ্টির বুকের ভেতরের সমস্ত জল যেন শুকিয়ে গেল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখে ইঙ্গিত করে চেয়ারে বসতে বলল। কোনোরকম প্রশ্ন করার আগেই মেয়েটির পরিচয় পর্ব শুরু হয়ে গেল।

মেয়েটির নাম মোহনা, আকাশের আফিসে তারা একসাথে কাজ করে, কাজের সূত্রে তারা একে অপরের খুব ভালো বন্ধু হয়েছে। আজ আকাশনীলের জন্মদিন বলে সেই আকাশকে খাওয়াতে এনেছে। আকাশই কথা আরম্ভ করল।

- বেরোবার সময় ভাবলাম তোকে একটা ফোন করি, যদি কাছাকাছি থাকিস, তাহলে দেখাও হবে, কথাও হবে আর পরিচয়ও করিয়ে দেব মোহনার সাথে।

- মোহনা আমারা নতুন বন্ধু হয়েছে, সেকথা তো তোকে প্রথমে জানাব।

কথাগুলো শুনে বৃষ্টি মনে মনে ভাবল সে ও আকাশ খুব ভালো বন্ধু, আকাশ তাকে সব কথাই বলে।

বৃষ্টি জানে আকাশের আরও মেয়েবন্ধু আছে, কিন্তু মোহনার সাথে পরিচয় নিয়ে আকাশের কেন এত কৌতুহল তা বুঝতে পারল না।

এবার মোহনাই তিন প্লেট বিরিয়ানির অর্ডার দিতেই বৃষ্টি - এই এতক্ষনে কথা বলল।

- না না, আমি বিরিয়ানি খাই না, তুমি আকাশকে খাওয়াতে এনেছো ওকেই খাওয়াও পরে না হয় অন্যদিন আমাকে খাওয়াবে।

- হ্যাঁ, আমরা খাব। আর তুই বসে দেখবি তা হয়না, না তোকে খেতেই হবে কিছু, আকাশের জোরাজুরিতে বৃষ্টি এক প্লেট ডিমটোস্ট নেয় । খাওয়া সেরে মোহনা বিল মিটিয়ে দেয়। বেরোবার সময় বৃষ্টিকে গাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইলে সে আপত্তি জানায়।

বাড়িতে ঢুকতেই মা হঠাৎ বৃষ্টিকে প্রশ্ন করে সে আজ বাইরে কিছু খেয়েছে কিনা। নিজের অজান্তেই মিথ্যে কথা বলে ফেলে, জানায় বাইরে কফি ছাড়া আর কিছুই খায়নি। আকাশের সাথে দেখা হওয়ার কথা তুলতেই চায় না। সেদিন রাতে ঘুম হয় না বৃষ্টির।

****

পরদিন অফিস যাওয়ার সময় মোহনার সাথে রাস্তায় দেখা হয় বৃষ্টির। তাকে দেখেই মোহনার চোখ দুটো যেন হীরের মতো চকচক করে ওঠে। খানিক ইতস্তত করার পর সে জিজ্ঞেস করতে থাকে আড্ডার ছলে, আকাশের সমস্ত পছন্দ অপছন্দের কথা। সেদিনের সাক্ষাতের পর বৃষ্টি আকাশের সাথে কথাবলা কমিয়ে দেয়।

একদিন অফিসের কাজে ডুবে থাকা বৃষ্টির কাছে হঠাৎ ফোন এল। ফোনটা করতেই আকাশের কাঁপা কনঠস্বর বৃষ্টিকে ভয়, আবেগে বশ করল।

কী হয়েছে জানতে চাওয়ায় জানা গেল মোহনার ধপপরফবহঃ হয়েছে।

ফোন রাখার পর অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে যায় হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে মোহনাকে ওঈঈট তে রাখা হয়েছে জানা যায়।

ও দাঁড়িয়ে অপেক্ষার পর বৃষ্টি দেখতে পায় আকাশ কোথেকে হন্তদন্ত হয়ে প্রায় পাগলের মতো এগিয়ে আসছে তার দিকে, মাথায় চুল উশকো খুশকো, অগোছালো জামাপ্যোন্ট, হাতে ওষুধের প্যাকেট। বিষন্ন মুখখানা দেখে বৃষ্টির বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রনা বিধল, তারই আবেগে আকাশ বলে ডাকাতে

- হ্যাঁরে কখন এলি।

- এই তো একটু আগে। মোহনাকে দেখে যাব।

কথা বলতে বলতেই ডাক্তার এসে বলল।

- পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে, সে বৃষ্টি বলে কাউকে খুঁজছে।

শুনেই বৃষ্টির বুকটা ধড়াস করে উঠল, মোহনা তাকে খুঁজছে কেনো, ঘোরের মধ্যেই কাঁপা গলায় বলে উঠল - আমিই বৃষ্টি, চলুন আমি যাচ্ছি।

*****

সারা ঘরে বিভিন্ন রকম যন্ত্র সাজানো, অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধতা ও ছন্দ নিয়ে কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘরের মাঝামাঝি একটা বেড, তাতে মোহনার আঘাত প্রাপ্ত শরীরখানা এলানো, কাছে যেতেই মোহনা বৃষ্টির হাত দুখানা চেপে ধরল।

- কী হয়েছে মোহনা, কষ্ট হচ্ছে ?

- হ্যাঁ বৃষ্টিদি, তুমি আমাকে একটা কথা দেবে।

- এসময় বেশি কথা বলা ঠিক নয়।

- যদি আমার কিছু হয়ে যায় তুমি আকাশকে দেখবে, ওর পাশে সবসময় থাকবে। বলো তুমি আমার কথা রাখবে তো ? এত ঝামেলার মধ্যেও বৃষ্টির চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল যে সে আকাশকে নিজের প্রানের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, আকাশের ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক বৃষ্টি সবসময় আকাশের ছায়া হয়ে থাকবে। কিন্তু এই সময় এসব কথা বলা উচিত হবে না ভেবে কথাটা গলাতেই চেপে সহজ গলায় বলে উঠল,

- না মোহনা, এ কি বলছ তুমি, তোমার কেন কিছু হতে যাবে। তোমাকে আকাশ এত ভালোবাসে, সেই ভালোবাসা তো আর এতটা দুর্বল নয় যে পরিনতি পাওয়ার আগেই দম বন্ধ হয়ে যাবে।

কথাগুলো কিছুটা এক নিঃস্বাসে বলে থামল।

বৃষ্টির কথাগুলো মোহনার চোখের কোন আর্দ্র করে তুলল, সে আর কিছু বলতে পারল না। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ কয়ে ফেলল। বৃষ্টি দেখল এসময় আর কিছু বলাঠিক হবে না ভেবে চেয়ার ছেড়ে বেরোবার জন্য তৈরী হতেই মোহনা বলে উঠল, তাহলে তোমার ভালোবাসা এত দুর্বল কেন বৃষ্টি দি ?

কথাটা যেন বৃষ্টির বুকে হাতুড়ির শত ঘা মেরে দিল, যন্ত্রনায় ছটফট করা মনটার অব্যক্ত স্বর হিসাবে মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা গোঙানির শব্দ। আর কিছু ভাবতে পারলনা, দৌড়ে বেরিয়ে পড়ল একেবারে রাস্তায়। বৃষ্টির শরীর অবশ হয়ে এল, মাথা ঝিম ঝিম করছে, টলতে টলতে সে একটা অটো ডেকে তাতে উঠে পড়ল। বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই মা হাজারটা প্রশ্নের বান ছুঁড়ে দিল বৃষ্টির দিকে। কিন্তু কোনো দিকে তাকানোর বা কোনো উত্তর দেওয়ার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার । চালিতের মতো নির্বাক হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

*****

বাইরে এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ৮টা, ঘড়ির কাঁটাটাও যেন অস্থির পানে চেয়ে তার দিকে। প্রথমে কিছুই মনে পড়াছিলনা, খানিকটা ধাতস্ত হতেই দরজা খুলল। দরজা খোলার শব্দে মা রান্নাঘর থেকে বলে উঠল, -

- ঘুম ভাঙল তবে, আকাশ ফোন করেছিল, মোহনা এখন অনেকটা সুস্থ, এটা জানাতে বলল আর কেন তুই আকাশের সাথে দেখা না করে চলে এলি সেটা বলতে ফোন করতে বলল তোকে।

আকাশ ও মোহনার কথা শুনে অবসন্ন মনটা বিষাদময় হয়ে উঠল, তবে মুখে কোনো কিছু বললনা। প্রচন্ড খুশি হয়েছে এমনভাবে বলে উঠল

-যাক্ বাঁচা গেল, ঝামেলা মিটল।

এরপর নিত্যকাজগুলো সেরে রাতে খাওয়ার পর বিছানায় বসে ভাবতে লাগল সে কী করবে বুঝতে পারছে না। মোহনা মেয়েটা সত্যিই খুব ভালো, ওর সুস্থ হওয়াতো আনন্দেরই, তবে আকাশ আবার তার জন্যই বৃষ্টির থেকে অনেক ক্রোশ দূরে চলে গেল, এতে সে দুঃখ পাবে নাকি, পরক্ষণেই মনে হল ভালোবাসায় সে এতটা স্বার্থপর হতে পারে না যে অন্যের ক্ষতি চাইবে, তাই ভাবল আকাশের আনন্দেই সে আনন্দিত কারণ এখন নিশ্চয় মোহনাকে ফিরে, পেয়ে আকাশের সেই যন্ত্রণাভরা মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে।

এই ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে, মোহনা ও আকাশের সাথে আর তেমন যোগাযোগ হয়নি। অনেক কিছুই বদলে গেছে, বৃষ্টি নিজের মনে আকাশের অস্তিত্বকে ঢেকে রাখত শিখে গেছে, সময় নাকি মানুষকে সব শিখিয়ে দেয়, হয়তো তারই ফলাফল।

এরই মধ্যে এক রবিবার সন্ধ্যায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে গল্পের বইয়ে ডুবে থাকা বৃষ্টির হুঁশ হল। দরজা খুলতেই অনেকদিন পর চেনা মুখ মোহনাকে দেখে একটু চমকেই গেল। আপ্যায়ন করে ঘরে বসাল।

- বৃষ্টি দি, আমার আর আকাশের বিয়ে ঠিক হয়েছে আসছে বৈশাখ মাসে তারই জন্য এলাম।

হাতে নিমন্ত্রণ পত্র ধরিয়ে দিতে বৃষ্টির মনে হল এবার তার মনে আকাশের প্রতি ভালোবাসায় ডুবে থাকা মনটাকেও চাপা দিতে হবে। এসব ভেবেই বৃষ্টি বলে উঠল,

- আকাশ এলনা তোমার সাথে ?

- না দিদি ওর খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু অফিসের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে দিল্লি যেতে হয়েছে তাই নেমতন্ন গুলো আমি সারছি। আমাকে বারে বারে বলেছে আমি যেন এসে তোমাকে বলেযাই।

*****

বৃষ্টির বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। বিবাহবিরুদ্ধ মেয়ের কথা শুনে মা চটজলদি পাত্র ঠিক করে ফেলেছে। বিবাহ স্থির হয়েছে সেদিনই যেদিন আকাশেরও বিয়ে। বিয়ের নিমন্ত্রন পত্র পৌঁছে গেল সবার কাছে, আকাশের কাছেও।

*****

আকাশের প্রত্যুত্তর যেন শুনতেই পেল না, ফোন কেটে গেল। বৃষ্টি নিজের মনকে প্রস্তুত করতে লাগল, কারণ সে একটা নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে। একটা নতুন পথ সাথে একটি অজানা মানুষ, যে নাকি তার চিরসথী হতে চলেছে।

চারিদিকে লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি, মাঝে মাঝে সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। বৃষ্টি নানা অলংকার ও নতুন বেনারসীতে সুসজিত, তবু পোড়া মনের জ্বালা মিটছে না। খালি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। হঠাৎ মা এর গলা শুনতে পেল - আকাশের কথা আর মনে পড়ছে না তো ?

মায়ের কথাটা শুনে চমকে উঠল বৃষ্টি। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে সে। মা সবই জেনে ফেলেছে, মেয়ের মনের কোনো কথাই অজানা নয় তার। মায়ের কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল, তবে খানিকক্ষন পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল - আকাশ আর বৃষ্টি সম্পূর্ন আলাদা, হ্যাঁ তারা একসাথে থাকে ঠিকই কিন্তু একসাথে চলতে পারে না। তাই আকাশ নিজের জীবনে বাঁচুক আর বৃষ্টি তার নিজের জীবনে।

*****

ছাদনাতলায় শুভময়ের সাথে শুভদৃষ্টি হল বৃষ্টির। ভাবতেই পারেনি সে যে এই এক মুহূর্তের চাউনিতে এতটা কাছের হয়ে যাবে শুভময়। বিয়ে সম্পূর্ন হয়েছে, এবার বিদায়পালা, ছোটোবেলার সমস্ত স্মৃতি বিজড়িত এই ঘরবাড়ি, জন্মের পর তার এত কাছের মানুষ মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এমন ছন্নছাড়া নিয়ম বৃষ্টিকে ভেতর ভেতর ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। শ্বশুড়বাড়িতে প্রথম রাত বৃষ্টির, যেমনটি ছোটো থেকে চেয়েছিল সে তেমনটিই পেয়েছে। শুভময় অন্য ঘরে, কালরাত্রি কাটেনি। সারারাত একটুও ঘুমোয়নি বৃষ্টি, সারারাত জানালা দিয়ে অঝোরে বৃষ্টি পড়া দেখেছে।

*****

বৌভাতের দিন সকাল থেকেই বাড়িতে গান বাজছে চারিদিকে যেন আনন্দের বন্যা বইছে। এমন অবস্থায় বৃষ্টি আর না খুশি হয়ে থাকতে পারল না। তবে মায়ের কথা বড্ড মনে পড়ছে, এরই মধ্যে শুভময় বৃষ্টিকে একটা সোনার আংটি উপহার দিয়ে প্রকাশ করেছে তার মনের কথা। সে বৃষ্টিকে পেয়ে কতটা খুশি তা শুভময়ের চোখ মুখ দেখে বোঝা যাছিল। শুভময়কে পেয়ে বৃষ্টিও খুশি, তবে আকাশকে ভোলেনি সে। আজও আকাশ তার প্রিয় বন্ধু, তবে আর যোগাযোগ হয়নি। বৃষ্টি এখন তার নতুন মা, বাবা, স্বামী, সংসার, চাকরি নিয়ে ভীষন ব্যস্ত এবং গুছিয়ে সংসার করছে সে।

*****

আজ সেইদিন যেদিন শুভময় তার জীবনে এসেছিল আর আকাশ হারিয়ে গিয়েছিল। তবে সেদিন বৃষ্টি মনের আকাশে ফুটে উঠেছিল সেই উজ্জ্বল তারা, শুভময়, যে তার মনের সমস্ত ব্যাথা বেদনা মুছে দিয়েছিল, ভরিয়ে দিয়েছিল তাকে ভালোবাসায়। আজ দশ বছর পরে শুভময়ের বৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা একচিলতেও কমেনি। আকাশের কথা জানার পর বৃষ্টির প্রতি তার ভালোবাসা বরং রেড়েই গেছে। বিবাহ বার্ষিকীতে মোহনাকে দেখেই এতগুলো পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল বৃষ্টির।

আকাশ আজও আসেনি, সে মুম্বাইয়ে। বৃষ্টি আজও আকাশ ছাড়াই কাটিয়ে দিল। আকাশকে বৃষ্টি যেভাবে খুঁজে বেড়ায়, কী জানি আকাশও তেমন টাই অনুভব করে কিনা।।

— রাজেশ্বরী পাল
Mathematics

অনূঢ়া

ভোরের কুজনে চোখ খুলে কৃষ্ণা দেখল ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বেজেছে। স্বামীর পাশ থেকে উঠে সে স্নান সেরে রান্নাঘরে যাবে সংসার খেলার কাজে। কাল সারা রাত মেয়েটা জ্বরের ঘোরে 'মা মা' করেছে। তাই মেয়ের সঙ্গে কৃষ্ণার ঘুম হয়নি অথচ প্রতিদিনের নিয়মে আজও তাকে হেঁসেল সামলাতে উঠতেই হল। শুধু কি আর রান্না করা, তার সঙ্গে ঠাকুর পুজো আছে, সময় মতো শ্বশুর মশায়ের ঔষুধ দেওয়া, শাশুড়ি মায়ের ফরমাশ মেটানো, দেবরের স্নানের জল -গামছা গুছিয়ে দেওয়া, মেয়ের ইস্কুল, হাট-বাজার, সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া, রাতের খাবার তৈরী, স্বামীর পদসেবা আরও কত সব কাজ। কোনো কাজের মধ্যে হিসাব যদি ভুল হয় তবে প্রথম থেকে আবার হিসাব মেলাতে হয়। এটাই হল কৃষ্ণার 'সংসার খেলার' আয়োজন।

সেই কোন ছোটবেলা তার বরের ঘরে আসা। তারপর থেকে নদীর প্রবহমানতার মতো সেও হাজার বাধা - গঞ্জনার স্রোত ডিঙিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম।

সারাদিনের কাজের পাহাড় সরিয়ে নিস্তব্ধ দুপুরে সে ছাদের বারান্দায় এসে যখন বসে তখন শান্তসরল মেয়েটার গালে সূর্যের সোনালী আভা যেন রামধনু মাখিয়ে দেয়। রোদে দেওয়া আচারের শিশির পাশে বসে কৃষ্ণা তার জীবনের দিনলিপিতে কলম ঘষে। ভাবতে ভাবতে হারিয়ে যায় অনেক দূরের সবুজ ঘেরা গ্রামে। যেখানে রেলাইনের ধারে বকুলতলায় অনেক ফুল ফুটেছে। গ্রামের মেয়েরা ফুল তুলে মালা গাঁথছে পুতুল খেলবে বলে। ওই মেয়েগুলোর মতোই কৃষ্ণাও পুতুল খেলতে বড় ভালোবাসে। কিন্তু ছোট মেয়ের পুতুল খেলায় যে সরলতা 'মুক্ত হাঁসির মতো ঝরে পড়ে। কৃষ্ণার পুতুল খেলায় সংসারের চাপ নানা জটিলতার আয়োজনে বাঁধা। সে ছুটে চলে যেতে পারে না রেললাইনের ওই বকুলতলায়। মায়ের কাছে গিয়ে বলতে পারে না একটা দিন ছুটির কথা। মা বলে দিয়েছেন বিয়ের পর স্বামীর ঘরেই তোর আসল জায়গা। বোঝেনি কেউ তাকে, বলেনি ছুটির দরখাস্ত বলে কিছু হয় না।

দুপুরের এই সময়টুকুতে কৃষ্ণা বইপুকুরে সাঁতার কেটে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। কেউ তাকে বারণ করতে পারে না। আটকাতে পারে না তার কলমের কল্লোল। স্বামী, বারো বছরের বিবাহিত জীবনে জানতেও পারল না স্ত্রীর মধ্যেকার লেখিকা হবার গোপন প্রয়াস কথা।

দিনের শেষে অন্ধকার নামে গলির মোড়ে। চাঁদের আলোতে কৃষ্ণা জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। স্বামী-সন্তান, বাড়ির লোক, গোটা পাড়া তখন আরামের ঘুমে মগ্ন। কৃষ্ণা জেগে আছে বলেই দায়িত্বের সুতোটা ছেঁড়েনি এখনো। ঘড়ির কাঁটা শব্দ করছে রাত হল অনেক। তবুও ঘুম আসছে না তার। ক্লান্তিমাখা ঠোঁটে কৃষ্ণার আত্ম অন্বেষণ। পথ চলছে সে তদূরের কোনো এক বাঁশির সুর শুনে। হঠাৎ ঝিঁঝিঁর ডাকে থমকে গেল একটা প্রশ্নের শব্দে। 'কোথায় চলেছ কৃষ্ণা ফিরে এসো, তোমার গান সংসারের যাঁতাকলে বাঁধা। নিত্য দাম্পত্যের খেলায়, কতবোর ভিড়ে তুমি হারিয়ে গেছ। তুমি এখনও অনূঢ়াই আছো'।

— শ্রাবন্তী ঘোষ
Bengali, 2019

অন্য আগমনী

রাত তখন প্রায় সোয়া দু'টো। কিসের যেনো একটা শব্দে পারিজাতের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম টা বরাবরই ভীষণ পাতলা। কলেজের এক বন্ধু মজা করে বলতো, "তোর নিজের বেড রুমের ঘড়িটা কে রাতে বন্ধ করে রাখিস, নইলে আবার সেটার টিক্ টিক্ শব্দেও তোর ঘুম ভেঙে যেতে পারে"।

আওয়াজটা নিচের ঘরের দিক থেকেই আসছে বলে মনে হয়, কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দের মত শোনাচ্ছে, এই ভেবে পারিজাত যেই না দরজা খুলবে, ঠিক তখনই বিছানায় থাকা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। " দরজা খোলার কোনো দরকার নেই, যা করার কাল ভোরে করতে হবে", সমীর বাবু পাশের ঘর থেকে ফোনে বললেন।

সমীর বাবু হলেন স্থানীয় এক বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের বাংলার শিক্ষক। একমাত্র ছেলে পারিজাতকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। ইচ্ছা ছিল ছেলে বড় হয়ে ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। সায়েন্স-এ বরাবরই ভীষণ কাঁচা পারিজাত। এতো জটিল অঙ্ক মাথায় ঢোকে না তার। সে ছোটো থেকেই কল্পনা-প্রবণ, একটু ভাবুক স্বভাবের। পারিজাতের আঁকার হাত ছিল অসাধারন। আশেপাশের এলাকার আঁকার প্রতিযোগিতায় ওকে কেউই টেক্কা দিতে পারতো না। আর এটাই ছিল সমীর বাবুর ছেলেকে নিয়ে একমাত্র গর্বের জায়গা। তাই ছেলের ইচ্ছাতেই ক্লাস টেন-এর পর পারিজাতকে বাড়ির কাছের স্কুলেই আর্টস নিয়ে ভর্তি করে দেন। সেই স্কুল থেকে পাশ করে অনায়াসে কলকাতার আর্ট অ্যাকাডেমিতে চান্স পেয়ে যায় পারিজাত। এখন তার ফাইনাল ইয়ার।

সব কিছু কেমন যেনো গোলমেলে লাগছিল পারিজাতের। ওই আওয়াজ শোনার পরও মা-বাবা এতো শান্ত কী করে ? নিচে সব কিছু ঠিক আছে তো? এই সব নানান প্রশ্ন তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল পারিজাতের মাথায়। এই বছর টা সত্যিই কেমন অন্য রকম। শুরু থেকেই কী সব মল মাসের চক্করে দুর্গা পুজোর এক মাস আগেই কাল মহালয়া। কি অদ্ভুত তাই না ? প্রায় দু মাসের বেশি হয়ে গেল ইন্টারনেট, রেডিও সবই বন্ধ। ফোন কল টা এখনও করা যাচ্ছে, সেটাই হয় তো কিছু দিন পরই বন্ধ হয়ে যাবে। এই সব কথা ভেবে পারিজাতের বুকের ভেতরটা কেমন ভারি হয়ে আসছিল। সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না এরকম দিন ও সত্যিই আসতে পারে। আর কিছুক্ষণ পরই ভোর হবে। চারটে বাজবে। তবে কি সত্যিই মহালয়া শোনা হবে না?

রাতের বেলা আগে যখন পারিজাতের ঘুম ভেঙে যেতো, তখন রং-পেন্সিল আর খাতা নিয়ে বসে পড়তো টেবিল ল্যাম্পের আলোয়। কত রকমের ছবি এঁকেছে এই ভাবে। কিন্তু আজ আর ছবি আঁকতে ইচ্ছে করল না। খাটের পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। শুকতারা-টাকে বারবার কিছু কালো মেঘে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে। কেমন একটা অজানা ভয় পারিজাতের মনে। সব কি আবার আগের মতই স্বাভাবিক হবে না? আরো কত দিন ?

শহর থেকে গ্রাম ছবিটা কত বদলে গিয়েছে। চারপাশে কেমন একটা অদৃশ্য আতঙ্ক। মানুষ, মানুষকেই এড়িয়ে চলেছে। এটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে- "কেউই কারুর না"। গোটা পৃথিবী-ই এক ভয়ানক অভিশাপে অভিশপ্ত। পরিস্থিতি এতটাই আয়ত্তের বাইরে যে, প্রতিদিন কতজন করে মানুষ মারা যাচ্ছে তার আর কেউ হিসাব মেলতে পারছে না। নিজের বেঁচে থাকাটাই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। অনেকের কাছে নতুন ভোরের আলো দেখতে পাওয়াটাও অনিশ্চিত। আজ ভোরে যে মহালয়া, সেটা হয়তো অনেকে মনেই রাখেনি। অন্য বছর এই সময়ে প্রকৃতি যেনো নব রুপে সেজে ওঠে। শুরু হয়ে যায় পুজোর প্রস্তুতি। একটু ভালো করে কান পাতলেই ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতে শোনা যায়। কিন্তু এখন ! অ্যাম্বুল্যান্স এর আওয়াজ আর মানুষের কান্না ছাড়া কিছুই কানে আসে না।

আগে ভোরে ঘুম ভাঙতেই, পাশের বাড়ির রাজাদার বাঁশি শুনতে পাওয়া যেত। কী মিষ্টি সুর, মনটা একেবারে ভরে যেত। রাজাদা খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেশ ফেমাস হয়ে গিয়েছে। রজতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এখনও শোনেনি এমন লোক খুবই কম। সারা বছরই দেশে-বিদেশে নানান প্রোগ্রাম করে বেড়ায়, কিন্তু পুজোর সময়টাতে পাড়ার বাইরে এক পা ও রাখত না। তবে এখন রাজাদা কথা বলার অবস্থাতেও নেই মনে হয়। কত মাস হয়ে গেল ওদের বাড়ি একেবারে ফাঁকা। মাস পাঁচেক আগে রাজাদা গিয়েছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল ফ্লুট কম্পিটিসনে, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে। ওখান থেকে বাড়ি ফেরার কিছু দিন পরই শুরু হয় জ্বর আর ধরা পরে টোড্।

প্রায় ছয় সাত-মাস আগে জার্মানীর দু'জন বিজ্ঞানীর প্রথম টোড্-এ আক্রান্ত হওয়ার খবর শোনা যায়। সমীর বাবু কাছ থেকেই

প্রথম এই টোড্ ভাইরাস সম্বন্ধে জেনেছিল পারিজাত। "টোড্" হল একটা জার্মান শব্দ, যার অর্থ হল "ডেথ" বা মৃত্যু। এই রোগের উপসর্গ বলতে প্রথমে সাধারণ জ্বর আর প্রচন্ড মাথা ব্যাথা। কিন্তু ধীরে ধীরে এই রোগের মারাত্মক দিকটা সামনে আসে। এই ভাইরাস প্রথমেই নার্ভাস সিস্টেম -কে আক্রমণ করে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে আক্রান্ত রোগী কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হতে শুরু করে। এর পর যত দিন এগোতে থাকে ততই এই ভাইরাস সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে রোগীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হতে শুরু করে আর আক্রান্ত রোগী ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকে। যদিও এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণের ধরন অন্য রকম। শরীরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই টোড্ এর লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তাই অজান্তেই আক্রান্ত রোগীর থেকে সুস্থ ব্যাক্তির শরীরে ছড়িয়ে পড়ে টোড্। এই ভাইরাসের ধরন যেহেতু বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়, তাই কোনো টিকা আবিষ্কার করা এখনও অবধি সম্ভব হয় নি। পারস্পরিক মেলামেশা কমানোই হল সংক্রমণ কমানোর একমাত্র উপায়। তাই প্রায় সাড়ে চার মাস হয়ে গেল লকডাউন চলছে। খুব জরুরি কাজ না থাকলে বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। বাড়ির কোনো সদস্য টোড্ এ আক্রান্ত হলে, বাড়ির লোকেদের রাখা হচ্ছে বাড়ির বাইরে স্থানীয় কোয়ারেন্টিন সেন্টারে আর রোগীকে পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে।

আজকের রাতটা যেনো শেষই হতে চাইছে না। ঘুম আসছে না, তাই জানলার দিকে চেয়ে থেকেই ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষায় পারিজাত। এই কয়েকটা মাসে প্রকৃতি যেনো নতুন প্রান পেয়েছে। লকডাউন হওয়ায় রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা অনেক কম, বেশির ভাগ কারখানাই বন্ধ, তাই দূষণ ও বেশ কম। দূষন কম হওয়ায় রাতের তারা গুলোকে একদম জ্বলজ্বলে দেখায়। আগে যেখানে ভোরে ঘুম ভাঙাতো গাড়ির হর্ন এর আওয়াজে, সেখানে এখন ভোর হতেই পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যায়। পশু-পাখিরা এখন যেনো নতুন জীবন পেয়েছে। কত মুক্ত তারা। শুধু মানুষ-ই মানুষের থেকে এখন আলাদা।

ভোরের আলো সবে ফোটা শুরু করেছে। কাল রাতের ওই শব্দ টা কিসের ছিল? আবার কোনো নতুন বিপদ অপেক্ষা করছে না তো? মনে মনে ভাবছিল পারিজাত। ঠিক তখনই মা এর চিৎকার শুনতে পেল পারিজাত। দরজায় টোকা দিয়ে সমীর বাবু বললেন " তাড়াতাড়ি নিচে এসে দেখ। যা ভয় করেছিলাম, আজ সেটাই হল"। বালিশের পাশে রাখা চশমাটা পরে, দরজা খুলে সিঁড়ি নিচে নামতেই দেখলাম সর্বনাশ!

প্রায় সাড়ে চার মাস হয়ে গেল গোটা দেশে লকডাউন চলছে। খাবারের সংকট দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে আর তার সাথে বেড়ে চলেছে খাবার লুট-পাটের ঘটনাও। এক মুঠো চাল-ডাল এর মূল্য সত্যিই কতটা বেশি সেটা এতদিনে সবাই বুঝে গিয়েছে। বাড়িতে টাকা থাকলেও দোকানে খাবার নেই। একমাস হয়ে গেল সমস্ত মুদির দোকান ফাঁকা। খাবারের এই আকাল সামলানোর জন্য সরকার থেকে সবার জন্য রেশন দেওয়া চালু হয়েছে। রেশনের পরিমাণ যথেষ্ট না হলেও, সেটা থেকে অল্প অল্প করে চাল, ডাল জমিয়ে রেখেছিলেন পারিজাতের মা। যদি পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়, কয়েকটা দিনের জন্য কোনো রকমে চালিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আজ একটা চালের দানা পর্যন্ত নেই। কাল রাতেই সবটা চুরি হয়ে গিয়েছে। আজকের খাওয়ার মতো ও কিছু অবশিষ্ট নেই।

অন্য বারের মহালয়ায় দিনে সমীর বাবু সকাল সকাল বাজার চলে যেতেন। বাজার থেকে ফেরার পথে ময়রার দোকান থেকে গরম কচুরি আর জিলিপি নিয়ে আসতেন। সেই সব কচুরি-জিলিপি, নাকে-মুখে গুঁজে পাড়ার ক্লাবে চলে যেতো পারিজাত। ক্লাবের সামনের মাঠটা বেশ বড়। গত বছর ছিল সেই পুজোর রজত জয়ন্তী। ওই বছর পারিজাতের হাত ধরেই ক্লাবের থিম পুজো শুরু হয়। পারিজাতের হাতে বানানো নিখুঁত নকশা আর রাজাদার দেওয়া ইনোভেটিভ আইডিয়া, এই দুই মিলে সেরার সেরা পুজোর সম্মান পায় " ইয়ং স্টার ক্লাব "। পুজো আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি থাকে, তাই মহালয়ায় পরের কটা দিন জোর কদমে কাজ করতে হয়। মহালয়ায় বাকি দিনটা প্যান্ডেল সাজাতে সাজাতেই কেটে যেত পারিজাতের। ক্লাবেই খাবার খেয়ে, একবারে রাতে বাড়ি ফিরত পারিজাত। এই বছর যদিও মহালয়ার এক মাস পর দুর্গা পুজো, তাই হয়তো ওতটা তারা থাকত না; কিন্তু সেটা আর এখন হওয়ার নয়। তবে এই বারও ক্লাবের মাঠে প্যান্ডেল হয়েছে। খুব বড় প্যান্ডল। প্রায় তিনশোটা বেড এর ব্যবস্থা আছে। সেখানেই আছে এলাকায় টোড্-আক্রান্ত রোগীর বাড়ির লোকজন। সত্যিই কতটা অন্য রকম এবারের আগমনী।

ঘড়িতে তখন সকাল আটটা। বাড়িতে আজকের রান্না করার জন্য একটুও খাবার নেই। টেবিল রাখা মাস্কটা পড়ে। ব্যাগ হাতে বেড়িয়ে পড়লো পারিজাত। এই কটা দিন দু-বেলা ভালো করে খাওয়া নেই, শরীর খুব দুর্বল পারিজাতের। রেশন দোকানটা বাড়ি থেকে

অনেকটাই দূর, প্রায় দেড় কিলোমিটারের হাঁটা পথ। প্রথম কয়েকটা দিন সাইকেল চড়ে রেশন আনতে যেত পারিজাত। কিন্তু একদিন রাস্তায় পেরেক ফুটে চাকা লিক্ হয়ে যায়। লকডাউন চলায় সেই চাকা মেরামত করতে পারেনি। আজও হেঁটেই যেতে হবে। ছাতা সঙ্গে নিয়ে বের হয়নি পারিজাত। দোকানের কাছে পৌঁছতে দেখে বিশাল লম্বা লাইন। প্রায় চল্লিশ জন লোক লাইনে। লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়াল পারিজাত। একে একে সবাই রেশন নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। পারিজাতের সামনে আর মাত্র তিনজন। সামনে যখন একজন বাকি, ঠিক তখনই দোকানের মালিক বলল, আজকের মত সব শেষ, যারা লাইনে আছেন, তাদের আগামিকালের জন্য কুপন দেওয়া হবে। কালকে এই কুপন দেখালে আগে রেশন দিয়ে দেওয়া হবে"। মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়ল পারিজাতের। আজ হয়তো সারাটা দিন না খেয়েই কাটাতে হবে। "মা - বাবা, তারাও আজ কিছু খেতে পারবেনা ? বাড়ি গিয়ে কী বলব আমি ওদের?", বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলো পারিজাত। ভাদ্র মাসের রোদ। মাথাটা কেমন একটা ঝিম ঝিম করছে পারিজাতের। পা যেনো আর চলছে না। চারপাশ কেমন ঝাপসা লাগছিল, ঠিক তখনই রাস্তার পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবরে পড়ল পারিজাত। চশমাটা ছিটকে দু'হাত দূরে গিয়ে পড়লো, গরম পিচ রাস্তার উপর তারপর সব অন্ধকার....

ফোনের অ্যালার্মটা বেজে উঠতেই, হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলো পারিজাত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পালস্ রেট তখন ঘোড়ার মত দৌড়চ্ছে। "ওফফ্ কী ভয়ঙ্কয় ছিল স্বপ্নটা!!", এই বলে এক গ্লাস জল খেয়ে কিছুটা শান্ত হল পারিজাত। ঠিক তখনই দরজায় খট্ খট্ করে টোকা দিয়ে সমীর বাবু বললেন, " চারটে তো বেজে গেল রে। ওঠ এবার। আমি রেডিও চালিয়ে দিয়েছি, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আয়"। একট দীর্ঘশ্বাস ফেলল পারিজাত। বালিশের পাশে রাখা চশমাটা পরে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো। শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে আসছে শিউলি ফুলের গন্ধ। তখন হঠাৎ করে পারিজাতের ফোনটা বেজে উঠল। " এই শোন, সাতটার মধ্যে ক্লাবে চলে আসিস। অনেক কাজ বাকি আছে। একমাস বাকি তো কী আছে? আজ থেকে উঠে পড়ে লাগতে হবে কিন্তু, রাজাদা ফোনে বলল। মনে তখন এক অবিশ্বাস্য শান্তি পারিজাতের। আশেপাশের বাড়ি থেকে তখন রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছে। শোনা যাচ্ছে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের স্বরে মহিষাসুরমর্দিনী। পারিজাত দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর শুনতে পাচ্ছে " বাজলো তোমার আলোর বেনু...."

সমাপ্ত

কমলা ভানু

National Social Service (NSS)

National Social Service বা NSS এই প্রকল্পের নাম ও কাজ এর সাথে, আমরা হয়তো আজ অনেকেই অবগত। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছিলেন - " ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তবে তার প্রকাশ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক।"

এই বাণীকে হয়তো পাথেয় করে ১৯৬৯ সালে "National Social Service" নামক প্রকল্পটি "মহাত্মা গান্ধীর" জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, দেশের কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক মন্ত্রক ও ভারত সরকারের জাতীয় ক্রীড়া কমিটি।

NSS প্রকল্পটি তৈরী হয়েছিল প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য, যাতে তাদের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটে এবং পক্ষপাতহীন ভাবে সমাজকে সেবা প্রদান করতে পারে। এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত স্বেচ্ছা সেবকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজের অসহায় পিছিয়ে পড়া ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের সাহায্য করা, তাদের জীবন-যাপন উন্নত করতে তাদের পাশে থাকা। এছাড়া প্রাকৃতিক ও মনুষ্য নির্মিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের খাবার, পোশাক ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে সহায়তা করা এবং সমাজকে সচেতন করা। এদের মূল মন্ত্র - "NOT ME BUT YOU"।

১৯৬৯ সালের ১৯ শে জুন, এই প্রকল্পের প্রথম স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কে. কে গুপ্ত। এরপর ঐ বছরের ২৪ শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ভি. কে. আর ভি রাও, দেশের সমস্ত রাজ্যের ৩৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই National Social Service বিভাগটি চালু করেছিলেন। এর পাশাপাশি রাজ্যের অনেক কলেজস্তরেও এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এমনই একটি কলেজ হল, আমাদের হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ। আমাদের এই কলেজের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত। তাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক হলাম আমি। আমাদের মতো যে সব শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন থাকে, সাধারন মানুষের জন্য কিছু সমাজ কল্যান মূলক কাজ করার, সমাজের পিছিয়ে পড়া বা আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বীহীন, অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর, তাদের জন্য অনবদ্য জায়গা হল এই NSS Unit।

আমাদের কলেজ, এই প্রকল্পের নাম ও ঐতিহ্যর কথা স্মরনে রেখে, বেশ কিছু কাজ করে থাকে। যেমন- সমাজের কিছু অসহায় ও সম্বলহীন মানুষের জন্য বস্ত্রবিতরণ, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বীতরণি। এমনকি প্রত্যেক মাসে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। কলেজ ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে গাছ লাগানো। এরকম আরো বেশ কিছু সমাজ সচেতন এবং সমাজ কল্যাণ-মূলক কাজ করে থাকে এই নরসিংহ দত্ত কলেজের NSS বিভাগ। তবে, এই মানব কল্যাণ-মূলক কাজে শুধুমাত্র আমাদের উৎসুক ছাত্র - ছাত্রীরাই যুক্ত তাই নয়, আমাদের পথপ্রদর্শক ও অবিভাবক হিসাবে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যুক্ত আছেন।

গত আমফান- এর মত প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও অতিমারি করোনা পরিস্থিতির সময়ে, আমাদের বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক এবং কিছু শিক্ষক- শিক্ষিকারা মিলে একসাথে লোকাল পুলিশের সহায়তায় যতটা সম্ভব বিপর্যস্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা করেছিলাম। এই সাহায্য ছাড়া এই সব মহৎ কাজের, পরিকল্পনা করা বা পদক্ষেপ নেওয়া বাস্তবিক ভাবেই অসম্ভব। বিগত এতদিন ধরে, এই মানব ও সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে NSS যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, এবং তার সদস্য থাকতে পেরে নিজেদের কে ধন্যমনে করি। এর সাথে এত মানুষের আর্শীবাদ এবং শিক্ষক - শিক্ষীকাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও স্নেহ সবই আমার কাছে ঈশ্বর দর্শনের সমতুল্য।

আমি নিজে বিগত তিন বছর এই NSS এ বিভাগের সাথে থেকে; কাজ করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাঙ্খিত অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছি। কিন্তু এখন আমি একজন প্রাক্তন ছাত্র, আর NSS এর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য মন আমার এখনও উদগ্রীব।

সেই মনোবাসনা পূরন করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষা মহাশয়া ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কলেজের Alumni Association এর সম্পাদিকা ডঃ লিপি দাস, আমাদের ম্যাডামকে, যিনি আমাকে এই সংস্থার সভ্য হয়ে NSS এর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য অনুপ্রানিত করেছেন।

সত্যি বলতে নিস্বার্থ ভাবে মানব সেবা বা সমাজ সেবার যে পরিতৃপ্ত আছে। তা NSS এর সাথে যুক্ত না থাকলে বুঝতাম

না, তাই নব্য তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার আবেদন, তারা যেন এগিয়ে এসে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। NSS প্রকল্পের ঐতিহ্যর ভাসমান তরীর যেন হাল ধরে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন-

" জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

সাহিত্য রায়
নৃবিজ্ঞান, ২০২০

— Swarnendu Ghosh
B.com (Hons.), 2019

— পিয়ালী দাস
B.A., 2020

Keeking Glass

A keeking-glass showing the face of you,
Not knowing what hidden inside you.
It can't ask, can't say, can't pretend
It can only particulate you,
Perhaps intentionally or unintentionally.
Sometime rubies glee;
When it comes across a tidy magnanimous person,
The stupid mirror unleashes an elated chuckle.
When a black face stands up in front of it,
It also chuckles.
Again and again proving the harmony
Of "no separtion"
If you try to get a hold of the hands of your mirror image,
With Your Own hands
You can't.
Here comes the silent illusion -
What you can see you may not touch,
You may not feel its entity !
In the world of variabilities
A keeking-glass is constant.
Orbs may differ,
But the glass won't replace you with me.
Oh magical paradigm !
You bag tidbits of every household
And metaphors of lives !

Ranita Chakraborty
Zoology, 2018

A Strange New Year

Another year of struggle like Greenhouse life
Storm of uncertainity, tremors of disorder,
Rummaged human life ahead - a riot in peace,
On a new journey, plunged into new unknown
Swarms of hope is pursuing a mirage,
To take a fresh breath of green elixir.
A Hollow land, of a weird maze to transcend
Refuging an unsen foe-an assailant in disguise.

Born of optimism is tethered, flasked in Laboratory,
Peeping through the glass-jars, slowly pulsating
Prayers of old memories are scpulchred, waiting
Being granted by a galaxy of propitious fortune.
A spectre of cloud is gradually condensing
For a new eruption of mystery Gas veiled,
The whole atlas underneath; seeking an antidote.

Time's fingers are holding our shackles tightly;
Dragging our corpses behind Achilles' chariot,
Around the grave as our dernier friend of life.
Hamlet;s palming of mortality vives solemnly,
As a gift of New Year to the lumanity.
Life is like a sinking submarine now,
Jostling with a valley of floating stones
As a fugitive, but, struggling to surmount
The very amercement of the Divine Justice.

A strange new year bring strange celebrations
A card of noble homage to the covid warriors,
Lighted candles dedicated to the martyrs,
Let this spectrum of light replace the shadows
Where the viewless enemies are dissolved in
Let the flora of budding faces receive
A pure prelude of life with dignity.
Let the Holy Azaan come out of the conch shell
And kill the rising kingdom of venomed air.

— Jhilik Santra
English (H), 2018

Habitat Restoration Programme in Santragachi Wetland

Habitat Restoration Programme in Santragachii Wetland, An Abode of Migratory waterbirds. – A Special effort from the teachers and Alumni members of Narasinha Dutt College.

Wetlands are waterbodies that occur where water meets land. They are the primary driving forces of life. They include mangroves, wetlands and marshes, rivers and lakes, deltas, floodplains and flooded forests, rice-fields, and even coral reefs. Waterbirds directly depend on the wetlands but also contribute to the proper functioning of wetlands in a deeper sense. Wetlands can be natural or man-made such as dam, reservoir, and pond. Wetlands perform important "Ecological Services" such as providing fresh drinking water, controlling of hydrological cycles locally & globally. It controls soil texture and biochemical nutrient cycling. It plays a pivotal role in water level maintenance. It maintains biodiversity in aquatic as well as terrestrial forms. It is the constant source of food, refuge, reproduction and migration avenues to different life forms. It is essential for agriculture & prosperity to us in every aspect. Wetlands act as a Co_2 sink and pollution controlling medium. It also reduces the chances of natural & man-made disasters. However waterbirds play a major role in the maintenance of nutrient cycling & biodiversity of wetlands. Waterbirds (especially migratory) are an important source of nutrient supply to waterbodies by contributing their "droppings". For this huge importance of Wetlands their conservation globally and locally Secretariat of the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971) was established. They prioritize the importance of wetlands locally and globally and monitor their health. Waterbirds play a major role in determining a wetland to be globally important and whether to be considered as "Ramsar Site" or not. Out of the 9 Ramsar criteria, the specific criteria based on waterbirds are criteria 5 & 6. Up to 2020, globally 2395 and in India 41 wetlands have been considered as "Ramsar Sites". This shows the importance of waterbird community in the conservation of wetlands locally and globally.

Waterbirds face great threats from different sources majorly of anthropocentric origin. Migratory waterbirds especially ducks are the most sufferers due to the confined area they reside and easy spotting. Some of the most direct threats to them are poaching & hunting for cheap meal by application of food with poison, setting up of net traps, angling etc. Some indirect serious threats to them are habitat degradation or destruction as well as habitat modification, overfishing, water pollution & eutrophication, changes in rainfall patterns. Mention may be made that all wetlands are equally vital for the sustainable functioning of ecosystem and maintaining biological diversity.

Those that are not included in the current Ramsar site by no means are less important as each of them plays a very important role in maintaining the balance of nature and combating pollution of air and water. One such wetland near our college in which migratory waterbirds reside in winter for last two decades is the Santragachi wetland. Originally it was an open pit later developed by South-eastern Railway for their purpose but later it became a very attractive place for migratory waterbirds and became a beautiful abode for them inside the busy locality. At first there were hardly one or two permanent houses beside the waterbody mainly surrounded by shrubs and tall vegetation. Later it was invaded by greedy peoples and promoters turned the spot into an association of flats of different heights. To add to the problem the house complexes run offs had a poor management system and majority of household liquid and solid wastes were directly thrown into the waterbody. This practice indulged in the addition of excessive 'Nitrogen' and 'Phosphorous' inputs into the wetland and resulted in a huge amount of "Eutrophication" for recent years. It has been a very robust negative impact on the natural habitat of waterbirds.

For the past years this waterbody was found to be endowed with a reasonably great number of migratory waterbirds ranging from a total population from 7000 to 9000. But in the last 3 to 4 years their number dropped to 800-2500. In 2018 it was the most miserable one and has seen the lowest number in appearance. This year the full waterbody was thoroughly covered by excessive Water-hyacinth and water quality was seen very poor. For years some of the most common visitors of the wetland were Gadwall (*Mareca strepera*) , Northern

Pintail (*Anas acuta*), Garganey (*Spatula querquedula*), Common Teal (*Anas crecca*) , Northern Shoveler (*Spatula clypeata*), Wigeon (*Mareca penelope*), Ferruginous Pochard (*Aythya nyroca*), Common Pochard (*Aythya farina*), Lesser Whistling Duck (*Dendrocygna javanica*), Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo*), Common Snipe (*Gallinago gallinago*), Swinhoe's Snipe (*Gallinago megala*), Purple Heron (*Ardea purpurea*), Common Moorhen (*Gallinula chloropus*), Bronze-winged Jacana (*Metopidius indicus*), Comb Duck (*Sarkidiornis sylvicola*) etc. Even in a year around 2010-11 Baikal Teal (Sibirionetta formosa) was observed there.

For last few years after the growing water-hyacinth cover problem started due to the poor behavioural practice of the locals residing in the complexes surrounding the waterbody. The draining systems were directly joined to the waterbody and they throw garbage from their balcony directly to the wetland in spite of the properly placed dumping boxes nearby. Railways and Howrah Municipal Corporation were taking the responsibility to clean the waterbody seasonally between October and November just before the winter. However during 2017-18 due to some misunderstanding between them the waterbody was not cleaned in due time. Local Nature lovers and some NGOs along with some students & teachers of collages unitedly started the responsibility to clean the waterbody. It was the collective effort from every layers of the society. By contributing funds, raising funds, giving voluntary services, helping others, giving food and water to the workers and above all encouraging and cheering for the team they all played their part to the service. Not only cleaning, we also built there resting islands in the middle of the waterbody. The result was astonishing and an increase in migratory bird's appearance from almost zero to a noticeable amount was observed!

Teachers, Students, Photographers, Doctors, Private workers all were united at the service! The main role was played by the members of the "Nature-Mates and Nature Club" of Kolkata. They were wholeheartedly joined by the students of Narasinha Dutt College and Shyampur Siddheswari College. Narasinha Dutt College students were guided by myself and the students of Shyampur Siddheswari College were guided by Prof. Prosenjit Dawn, Assistant Professor of the college as well as the Alumni of Narasinha Dutt College just like myself. Many of the students participated in the work were present and ex-students of the Narasinha Dutt college. Teachers of Narasinha Dutt College also contributed good amount of funds for the working team. We as the young field explorers and teachers` gathered the youth power of our society successfully at the service of Nature. It was one of the efforts of "habitat restoration programme" that was intensely contributed by the alumni members of our college. We are hoping for a better future of our naturally rich habitat and diversity. We tried to engage a good portion of the society in educating about the values and importance of ecosystem, habitat, biological diversity and conservation of them.

We wish to carry on the service in future.

Dr. Anirban Sinha
Zoology Honours 2003
Assistant Professor in Zoology
Narasinha Dutt College

1. Our Alumni Member Prof. Prosenjit Dawn along with his volunteer cleaning hyacinth chunks

2. Members of the serving team along with myself cleaning the menace.

3. Our team members at the service.

4. Pairs of Northern Pintail (Anas Acuta) were framed engaged in a grouping at Sanitragachi.

A Tale of Audio Story

When I was 16, a school goer of class XI, I found interest in audio story. Niladri, my school friend and tuition mate informed me about a weekly radio programme that presents Bengali dramatic effects and background music. The name of the program is `Sunday Suspense', and it is broadcasted on Radio Mirchi 98.3 FM (Kolkata).

Some `Sunday Suspense' stories were transferred to my Nokia 2700-Classic mobile phone from Niladri's Nokia 2700-classic via Bluethooth on that very day. The first story that I listened to was "Mahori Kuthite Ek Rat" by Premendra Mitra, and I literally fell in love with its presentation. RJ Mir and RJ Neel narrated and enacted the story and listening to its my first reaction was, " It's awesome, man ! "

I don't know at which pont, but there grew a passion in me to do the same thing - 'audio story'. In simple words, I wanted to be an audio story narrator just like the professional artists of 'Sunday Supense'. The main two audio story narrators of 'Sunday Suspense', Mir (Mir Afsar Ali) and Deep (Deepanjan Ghosh), became my favouites within very short time. I began ti copy their styles as I found copying the only way to get something out of it !

I remember, the first thing I recorded using the voice recorder of my mobile phone was the first few paragraphs of " Byomjatrir Diary", a Professor Shonku Science-fiction by Satyajit Ray, Listening to it I got to know how rustically I pronounce some of the Bengali words and alphabets.

The practice went on and with practice I was getting a somewhat moderately handsome grip over it. I was such fascinated with audio story, especially 'Sunday Suspense' that it became my favourite hobby-reading stories and making audio stories.

Meanwhile, I contacted the 'Sunday Suspense' team/ I wrote a letter (listener's opinion) to the director, Indrani Chakraborty, narrating my encounter with 'Sunday Suspens' and my intense like and passion for audio story. I got a response from the director. I was called up and told to visit their office to have chat with them. It was my first visit to Radio Mirchi Kolkata office. I met the director, the story narrators, and the soundscape designer of 'Sunday Suspense' and had chat with them. As a fan, I was gifted some Bengali Story books, some goodies and a Sunday Suspense DVD consisting of two Feluda stories autographed by RJ Deep.It was the occasion of Teachers' Day 2014 in my college, Narasinha Dutt College, Howrah, where along with my classmates, Abhirup Das and Aditi Mukherjee, I performed a live audio story in front a little crowd at the Department of English. The Story was "Telephone" by Satyajit Ray. The duration was around 8 minutes and the response was fairly good. It was some pleasing experience that can hardly be expressed in words.

[youTube Link - Telepjone by Satyajit Ray | Live Audio Story Performance | Teachers' Day 2014 | Read by Soumen, Abhirupm Aditi]

We performed again in 2015 Teachers' Day function at the English Department of our college. This time the story was "Kutum Katam" by the same author.

In mid-2015, I was called up by Radio Mirchi to take part in a special voluntary project, 'Lend Your Voice'. It was basically a campaign in which the volunteers would record audio stories from some prominent Bengali Story books in their voice. Those audio books would then be given to the visually impaired persons, who are fond of stories, so that they could go through the stories only by listening to them. I consider myself supremely lucky and privileged for being a part of it as the campaign was initiated with a noble purpose.

Working for 'Lend Your Voice' was also a very self-satisfactory exprericence. As a volunteer I recorded 3 books :

1. The Kakababu Story, "Jungier Moddhye Ek Hotel" by Sunil Gangopadhyay,
2. The Rijuda adventure, " Gurunogumbarer Deshe" by Buddhadeb Guha, and

3. "Hirer Angti" by Shirshendu Mukhopadhyay

In January, 2018, I started my YouTube Channel (Soumen Ghosh) featuring my audio stories. Some of the stories are in collaboration with my dear friend Abhirup Das. There are some other contributors as well - Anirban Mukharjee, who helps me with his composition of background score and theme music; Keya Ghosh, Peu Mondal and Dipannita Majumdar, who do the recordings of the female. characters and sometimes suggest me stories; and Kaustav Chakraborty helps me by designing the covers for the audio stories. I am thankful to all of them from the bottom of my heart. Link - YouTube Channel - Soumen Ghosh (Audio Stories)

Soumen Ghosh
English - 2015

Performing at Teachers' Day Program, 2015 | Dept. of English, NDC

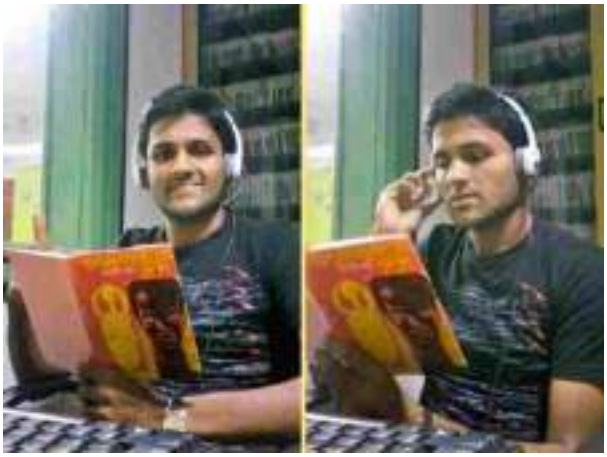

Recording for 'Lend Your Voice' Campaign (2015)

Certificate & CD of 'Lend Your Voice'

NARASINHA DUTT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

129, BELILIOUS ROAD, HOWRAH - 711 101

Regd No. - S/12/51524